

ই বিশ্ববরেণ্য সাধক

॥ মণি বাগচি ॥

সেই বিশ্ববরেণ্য সাধক

যত মত, তত পথ।
—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

সুতপা প্রকাশনী
কলিকাতা-২৩

SEYI BISWAVARENYA SADHAK

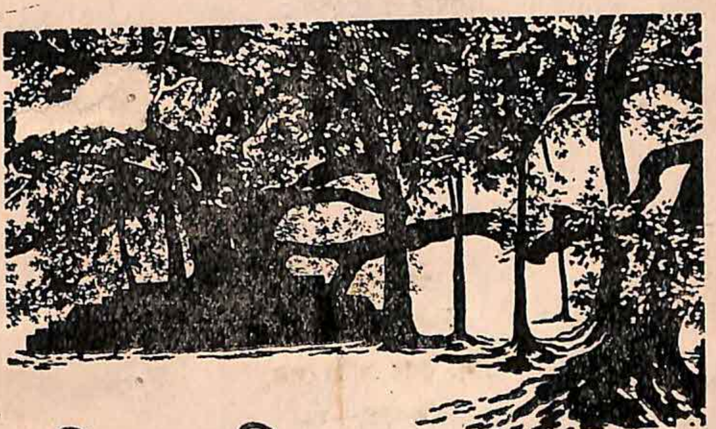
A Bengali biography of

Sri Sri Ramakrishna Paramhansa

By : Moni Bagchee

(Binding)

সেই বিশ্ববরেণ্য সাধক



মণি বাগচি

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ১৯৬৪

প্রচ্ছদ : শ্রীসুমুখ মিত্র

দাম তিন টাকা

একমাত্র পরিবেশক :
শি ক্ষা - ভা র তী
৯।৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রকাশিকা :
শ্রীলতিকা দেবী
৪সি, রজব আলি লেন,
কলিকাতা—২৩

মুদ্রাকর :
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ভৌমিক
রুবী প্রিন্টিং হাউস
৪০/১-বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
কলিকাতা—১২

বাংলার ধর্মগুরু

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর

পুণ্য স্মৃতিতে

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা ;
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যে নতুন জীবন-চেতনা নিয়ে একদা এই দেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, সেই চেতনা কিভাবে আমাদের যুগ ও জীবনকে উদ্বুদ্ধ করেছে তা সকলেই জানেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ একটি অখণ্ড যুগচক্র। শতাব্দীর পটে এই দুই উজ্জ্বল বিগ্রহ-মূর্তি আজ ধর্মপ্রাণ নর-নারীর নিত্য স্মরণের বিষয় হয়ে উঠেছেন। সে পূজার কোনো মন্ত্র নেই—শুধু হৃদয়ের ভক্তি নিবেদন করলেই হোল।

'সেই বিশ্ববরেণ্য সাধক' এই ভক্তিরই অঞ্জলি।

মণি বাগচি

সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪
৯০, বাগুইআটি রোড
দমদম, কলিকাতা-২৮

॥ আমাদের অন্যান্য বই ॥

॥ জীবনী ॥

সেই বিশ্ববরেণ্য সাধক

সেই বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী

লোকমাতা নিবেদিতা

জননায়ক জওহরলাল

বাংলার বাঘ আশুতোষ

॥ উপন্যাস ॥

ইন্দ্রনীলা

অচেনা আকাশ

মোহ থেকে মুক্তি

মুক্তিস্নান

॥ বিবিধ ॥

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে

সাপ

কেমন করে এল এরা

॥ পরবর্তী বই ॥

মণি বাগচির

দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র



« শ্রী »

« রামকৃষ্ণ »

১

জানবাজারের রাণী রাসমণি।

বিষয়কর্মে যেমন নিপুণা, তেমনি ঈশ্বরে বিশ্বাস।

তেমনি দেব-দ্বিজে ভক্তি। আবার গরীবের মা-বাপ তিনি।

অজস্র দান আর অকাতর অন্নব্যয়—রাণীকে সেদিন সকলের প্রিয় করে তুলেছিল। এই কৈবর্ত-কূলবধূ কোলকাতার হিন্দু সমাজে বিপুল প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন।

রাণীর একবার ইচ্ছা হোল কাশী যাবেন।

সেখানে দর্শন করবেন বিশ্বেশ্বর আর অন্নপূর্ণা।

এই ইচ্ছা তাঁর অনেক দিনের। এই তীর্থদর্শনে যাবেন মনস্থ করেই তিনি অনেক দিন থেকে অনেক টাকা সঞ্চয় করে রেখেছিলেন। রাণী অহল্যাবাঈ ও রাণী ভবানী প্রভৃতি যেসব প্রাতঃস্মরণীয়া নারী যে তীর্থে গিয়ে বহুবিধ দান-ধ্যান করে অশেষ কীর্তি অর্জন করেছেন, সেই কাশীতীর্থে যাবেন রাণী রাসমণি। রাণীর মতোই দান-ধ্যান করবেন সেখানে গিয়ে—এই ছিল তাঁর মনের ইচ্ছা।

রাণীর ছেলে নেই—চার মেয়ে, সকলেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তৃতীয় জামাতা মথুরানাথ তাঁর পুত্রতুল্য। একদিন তিনি মথুরানাথকে ডেকে বললেন—বাবা মথুর, কর্তা মারা যাওয়ার জন্য কাশী যাওয়া

হয়ে ওঠেনি। এবার আমি বিশ্বেশ্বর দর্শনে যাব, মনস্থ করেছি। তুমি সব ব্যবস্থা করো।

এ ঘটনা আজ থেকে একশো পনর বছর আগের কথা। মথুরানাথ আয়োজন করতে লাগলেন। আয়োজন যখন সম্পূর্ণ, সেইসময়ে যাত্রার ঠিক আগের দিন, রাত্রিতে রাণী স্বপ্নে দেবীর দর্শনলাভ ও প্রত্যাদেশ পেলেন। অদ্ভুত সেই প্রত্যাদেশ—এমন প্রত্যাদেশ কেউ কখনো পেয়েছে বলে মনে হয় না।

"কাশী যাবার দরকার নেই। গঙ্গার ধারে একটা ভালো জায়গায় আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা কর। আমি ঐ মূর্তির মধ্যে আবির্ভূতা হয়ে তোমার কাছ থেকে নিত্যপূজা গ্রহণ করব।"

রাত্রে স্বপ্নে এই প্রত্যাদেশ পেলেন রাণী।

পরের দিন। সকালবেলা। মথুরানাথ এসে বললেন, "মা, আয়োজন সব প্রস্তুত। আর কয়দণ্ড পরেই যাত্রার শুভক্ষণ। একশোখানা নৌকো সঙ্গে যাবে।

—মথুর, আমি কাশী যাব না।

—যাবেন না?

—না। স্বপ্নে আমি মায়ের আদেশ পেয়েছি। তুমি আজ থেকে গঙ্গার ধারে জমি দেখতে আরম্ভ করো। আমি এখানে মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা করব।"

তীর্থযাত্রা বন্ধ হয়ে গেল।

স্বপ্নে মা ভগবতী তাঁকে দর্শন দিয়ে বলেছেন, গঙ্গাতীরে মন্দির নির্মাণ করে আমার পূজা করো, আমি এখানেই তোমার পূজা গ্রহণ করবো, তোমায় তীর্থে যেতে হবে না—এ তো স্বপ্ন নয়, ভাবলেন ভক্তিমতী রাণী, এ প্রত্যাদেশ। এই বিশ্বাসে তিনি অটল রইলেন। গঙ্গাতীরে উপযুক্ত জমি খুঁজতে লাগলেন মথুর। কাশী যাবেন বলে

এতকাল তিনি যে টাকা জমিয়েছিলেন সেই সঞ্চিত ধনরাশি প্রত্যাদিষ্ট মন্দির তৈরির কাজে লাগাবেন ঠিক করলেন।

অনেক খোঁজার পর অবশেষে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে গঙ্গার তীরে মনের মতোন জমি পাওয়া গেল। রাণীর খুব পছন্দ হোল। কোলকাতার কাছেই গঙ্গার তীরে কেনা হোল ষাট বিঘা জমি। সেই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের ওপর মন্দির তৈরির কাজ আরম্ভ হোল শুভদিনে। দেখতে দেখতে সেইখানে নবরত্নপরিশোভিত এক বিরাট মন্দির মাথা তুলে দাঁড়ালো। এইটা হবে দেবীর মন্দির। তার পাশেই তৈরি হয় রাধাকান্তের মন্দির। সুদক্ষ শিল্পী দিয়ে গড়ানো হোল মা ভবতারিণী আর রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি। একটি বাক্সের মধ্যে বন্ধ রাখা ছিল সেই মূর্তি তিনটি। এক রাত্রে রাণী স্বপ্ন দেখলেন, মা যেন বলছেন, বাক্সের মধ্যে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, শিগ্‌গির আমাকে প্রতিষ্ঠা করবার ব্যবস্থা করো।

তখন আষাঢ় মাস।

সামনেই রথযাত্রা।

রাণী ভাবলেন, এই পুণ্যতিথিতেই তিনি মায়ের প্রতিষ্ঠা করবেন। জগদম্বাকে অন্নভোগ দেওয়ার জন্য তাঁর প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। মনের মতোন মন্দির তৈরি হয়েছে, নিত্য সেবার জন্য যথেষ্ট সম্পত্তির ব্যবস্থা করেছেন। লোকে বলবে, রাণী রাসমণি কতবড়ো কীর্তি রেখে গিয়েছেন।

মা, আমি নাম যশ চাই না। তুমি এই মন্দিরে নিত্য প্রকাশিত থাক – এই আমার অন্তরের অভিলাষ। এই কথা ভাবেন রাণী আবার পরমুহূর্তে তাঁর অন্তর বিষাদে ভরে ওঠে—যদি নিত্য অন্নভোগ দিতে না পারি, তবে সবই বৃথা।

মন্দির তৈরি হোল।

সুন্দর কারুকার্য করা নবরত্নমন্দির।

বহু অর্থব্যয়ে দেবীর মূর্তিও গড়িয়ে আনা হয়েছে।

বাকী এখন প্রতিষ্ঠা। তিনি যে কৈবর্তের মেয়ে, তাঁকে এজন্য ব্যবস্থা নিতে হবে ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের কাছ থেকে। তিনি যে দেবীকে অন্নভোগ দেবেন—এ ব্যবস্থা তো ব্রাহ্মণেই দেবেন। এই শাস্ত্রের বিধি। এই প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে তো কাজ করবার অধিকার তাঁর নেই। যদি তা করেন তা হোলে ভক্ত ব্রাহ্মণ সজ্জনেরা এই মন্দিরের ছায়া মারাবেন না, প্রসাদ গ্রহণ করা তো দূরের কথা।

তবে উপায় ?

রাণী চিন্তাকূল হোলেন। মথুরকে ডেকে পাঠালেন। বললেন—মথুর, পণ্ডিতদের কাছ থেকে ব্যবস্থাপত্র আনাবার ব্যবস্থা করো।

—ব্যবস্থাপত্রের দরকার কি, মা ? আপনার ভক্তিতে আপনি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন, আপনি ভক্তিভরে মায়ের অন্নভোগ দেবেন—এর জন্য আবার বামুনদের খোশামোদ করা কেন ?

—তা হয় না, মথুর। আমার জাতি আর সামাজিক প্রথা দেবীকে অন্নভোগ দেবার পথে প্রধান বাধা। শাস্ত্রের যা বিধি তা আমাকে মানতেই হবে। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের কাছ থেকেই আমাকে ব্যবস্থা নিতে হবে।

বুদ্ধিমতী রাণীর কথায় মথুর বিস্মিত হোলেন। তাঁর সেই বিস্ময় শ্রদ্ধায় পরিণত হোল। তিনি রাণীর নির্দেশ মতো কাজ করলেন। চারদিকে লোক ছুটলো ব্যবস্থাপত্রের জন্য। বাংলা ও বাংলার বাইরে সকল পণ্ডিতের কাছে ব্যবস্থা চেয়ে পাঠানো হোল। নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, বিক্রমপুর, কাশী—সর্বত্র রাণীর লোক ছুটলো।

কৈবর্তের মেয়ে দেবীর অন্নভোগ দেবেন।

সে কি করে হয় ? যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই কথা শোনেন, তিনিই ঘাড় নাড়েন ; বলেন—না, অন্নভোগ দেওয়া চলবে না। অন্নভোগ

হোলে কোনো সদাচারী ব্রাহ্মণ কৈবর্ত-পূজিত দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করবেন না।

এই ব্যবস্থাই আসতে লাগলো চারদিক থেকে।

শাস্ত্রের প্রমাণ তুলে বিরচিত সেইসব ব্যবস্থাপত্র মথুর পাঠ করে রাণীকে শোনান। ভক্তিমতী রাণী নিরাশ হোলেন না। সব জায়গা থেকে ব্যবস্থাপত্র তখনো যোগাড় করা হয়নি। দ্বিগুণ উৎসাহে ব্যবস্থাপত্র যোগাড় করবার জন্য আবার রাণীর লোক ছুটলো নানাস্থানে। যেসব পণ্ডিত কাছাকাছি জায়গা থেকে এসেছিলেন ব্যবস্থাপত্র নিয়ে, রাণী তাঁদের প্রত্যেককে বিধিমত বিদায় প্রদান করলেন।

দিন যায়।

রাণী উৎকণ্ঠিতচিত্তে দিন অতিবাহিত করেন।

মা, তুমি কি আমার দেওয়া অন্নভোগ গ্রহণ করবে না?—শুধু এই একটি প্রশ্ন দিনরাত উঠছিল তাঁর অন্তঃকরণ থেকে। এদিকে স্নানযাত্রার দিনও সমাগত প্রায়। দক্ষিণেশ্বরে এই মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা ইতিমধ্যে বাংলার চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। শাস্ত্রব্যবসায়ীরা শাস্ত্র বুঝলেন, বুঝলেন না এক ভক্তিমতী নারীর হৃদয়ের নিঃস্বার্থ কামনা। শাস্ত্রের নির্দেশ সত্য, না হৃদয়ের ভক্তি সত্য?—এই বিচিত্র প্রশ্নের মীমাংসার জন্য উৎকণ্ঠায় রাণী যখন দিনযাপন করছিলেন, তখন একদিন মথুর এসে তাঁকে বললেন—মা, এতদিনে বুঝি আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হোল।

রাণী চমকিত হোয়ে ওঠেন।

—পেয়েছ মথুর, ব্যবস্থা পেয়েছ?—জিজ্ঞাসা করেন তিনি আকুলভাবে। সে আকুলতা ফুটে ওঠে তাঁর দুই চোখের দৃষ্টিতে।

—হ্যাঁ, মা। ঝামাপুকুরের টোল থেকে ব্যবস্থা পেয়েছি।

—কে ব্যবস্থা দিয়েছেন?)

—পণ্ডিত রামকুমার ভট্টাচার্য।

—কি ব্যবস্থা দিয়েছেন তিনি ?

মথুর পড়লেন ঃ "রাণী যদি তাঁর গুরুদেবের নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তা হোলে অন্নভোগ দেওয়ার কোনো বাধাই হবে না ও ব্রাহ্মণরা বিগ্রহের প্রসাদ গ্রহণ করলে দোষভাগী হবেন না। প্রতিষ্ঠার আগে গুরুদেবের নামে মন্দিরের যাবতীয় সম্পত্তি লিখে দিতে হবে আর তখন ঐ মন্দিরে দেবীপ্রতিষ্ঠা করে অন্নভোগের ব্যবস্থা করলেই শাস্ত্রনিয়ম যথাযথ রক্ষিত হবে।"

রাণীর উৎকণ্ঠার নিরসন হোল।

দেবী ভবতারিণী তা হোলে মুখ তুলে চেয়েছেন।

আর সাতদিন বাদেই রথযাত্রা। ব্যবস্থা পাওয়া গেল, কিন্তু আর একটা বাধা এসে দেখা দিলো। কোনো ব্রাহ্মণপণ্ডিত পূজো করতে রাজী হোলেন না।

—মা, কোনো ব্রাহ্মণ তো পাচ্ছি না, বলেন মথুর।

—যিনি ব্যবস্থা দিয়েছেন তাঁকেই একবার অনুরোধ করে তুমি লোক পাঠাও।

রাণীর লোক এলো একদিন ঝামাপুকুরের টোলে। এমন উদার ব্যবস্থাদান যিনি করতে পারেন, তিনিই তাঁর মন্দির-প্রতিষ্ঠায় পৌরোহিত্য করার উপযুক্ত, এই ছিল সেদিন ভক্তিমতী নারীর সিদ্ধান্ত। জানবাজার থেকে রাণী রাসমণির লোক এসে তাঁর অনুরোধের কথা নিবেদন করলো রামকুমারের নিকট। তিনি সে অনুরোধ গ্রহণ করলেন—মন্দির-প্রতিষ্ঠা কাজে সানন্দে ব্রতী হোতে রাজী হোলেন।

শুভ রথযাত্রার দিনে রাণীর সংকল্প পূর্ণ হোল।

প্রতিষ্ঠিত হোলেন দেবী ভবতারিণী নবরত্নবিশিষ্ট সেই মন্দিরে। গঙ্গার তীরে বাঙালীর এক নতুন তীর্থ স্থাপিত হোল।

মন্দির-প্রতিষ্ঠা উৎসব তো নির্বিঘ্নে হোয়ে গেল। কিন্তু আর এক বিঘ্ন উপস্থিত। নিত্যপূজার জন্য যজন-যাজনক্ষম কোনো ব্রাহ্মণ পাওয়া গেল না। কাকে এখন পূজারীপদে ব্রতী করা যায়?—অবশেষে রাণীর অনুরোধ-পত্র নিয়ে আবার লোক এলো রামকুমারের কাছে। "সুযোগ্য পূজক না পাওয়া পর্যন্ত আপনি অনুগ্রহপূর্বক পূজকের আসনগ্রহণে স্বীকৃত হোন"—এই ছিল রাণীর অনুরোধ। জগদম্বার অর্চনা বন্ধ হবে?—চিন্তা করলেন রামকুমার। দেবীভক্ত রামকুমার রাণী রাসমণির অনুরোধের মধ্যে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাকে যেন প্রত্যক্ষ করলেন।

তিনি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভবতারিণীর পূজকের পদ গ্রহণ করলেন।

২

এইবার কামারপুকুরের ভট্‌চার্য্যিদের কথা বলি।

আসলে তাঁরা চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ—লোকে ডাকতো ভট্‌চায্যি-ঠাকুর বলে। হুগলী জেলায় কামারপুকুর নামে শান্ত নিভৃত একটি গ্রাম। সেই গ্রামে বাস করতেন ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় নামে এক নিষ্ঠাবান নির্লোভ ব্রাহ্মণ। তিনি শূদ্রের বাড়ি পূজা করতেন না, কিম্বা শূদ্রের দান গ্রহণ করতেন না। তাঁকে যে দেখতো তারই মনে হোত যে, এঁর শরীরে ব্রহ্মণ্যদেব যেন সর্বদা বিরাজ করছেন। গ্রামের আবালবৃদ্ধবণিতা তাঁকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতো।

ক্ষুদিরামের স্ত্রী চন্দ্রাদেবী।

বাড়িতে সবাই তাঁকে ডাকতো 'চন্দ্রা' বলে।

চন্দ্রাদেবী যেন দয়া ও সরলতার প্রতিমা। তাঁর আপন-পর বোধ ছিল না। যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা ; ক্ষুধিত ও অভুক্ত অতিথিদের নিজের মুখের অন্ন তুলে দিয়েও সেবা করতেন। এমন অনেক দিন গিয়েছে যখন সমাগত অতিথিকে নিজের অন্ন ধরে দিয়ে চন্দ্রাদেবী সামান্য মুড়ি খেয়ে অথবা একেবারে উপবাসে কাটিয়েছেন। ক্ষুদিরামের পর্ণকুটীরে গৃহ-দেবতা রঘুবীর যেমন নিত্যপূজিত হোতেন, তেমনি প্রতিদিন অতিথি অভ্যাগতদের সেবা ছিল বাঁধা। সবাই বলতো, ক্ষুদিরামের যেন ধর্মের সংসার, শিবের সংসার।

রামকুমার এই ক্ষুদিরামের বড়ো ছেলে। ক্ষুদিরাম যখন তাঁদের পৈতৃক ভিটা ছেড়ে কামারপুকুরে আসেন, তখন একমাত্র পুত্র রাম-কুমারের বয়স দশ ও মেয়ে কাত্যায়নীর বয়স চার বছর। এর পর তাঁর আরো দুটি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে—রামেশ্বর ও গদাধর। এই গদাধরই পরবর্তীকালে বিশ্ববরেণ্য সাধক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস নামে পরিচিত হন। ইংরেজী ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী (বাংলা ১২৪২ সাল, ৬ই ফাল্গুন) শেষরাত্রে গদাধর জন্মগ্রহণ করেন।

গদাধরের জন্মের ঠিক আগে ক্ষুদিরাম তীর্থদর্শনে গিয়েছিলেন। গয়াতীর্থ। অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর তীরে গয়াতীর্থ। তীর্থ নয়, তীর্থরাজ। বিষ্ণুর পাদপদ্ম ধারণ করেই তো গয়া হিন্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই বিষ্ণুমন্দিরেই এক রাত্রে নিদ্রাকালে ক্ষুদিরাম এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখেছিলেন। এক অমর্ত্যলোকে এসেছেন তিনি। সেইখানে বাস করেন তাঁর পিতৃপুরুষগণ। পিতৃপুরুষেরা দাঁড়িয়ে আছেন করজোড়ে দুই সারি দিয়ে আর তাঁদের মাঝখানে রত্নময় এক সিংহাসনে বসে আছেন জ্যোতির্ময় এক পুরুষ। কী তাঁর রূপ! নবদূর্বাদল শ্যামতনু। ব্রাহ্মণের চোখ আর ফেরে না সেই অপরূপ রূপ দেখে। কী স্নিগ্ধ সুপ্রসন্ন দৃষ্টি সুখাসনে উপবিষ্ট সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের। সহাস্যবদনে তিনি তাকালেন ব্রাহ্মণের দিকে, কাছে যাওয়ার জন্য ইঙ্গিতে ডাকলেন তাঁকে। যন্ত্রের মত পরিচালিত হয়ে তিনি যেন তখন তাঁর সামনে উপস্থিত হোলেন। নবদূর্বাদল সেই শ্যামতনুর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ব্রাহ্মণের মুখে উচ্চারিত হয় স্তুতি আর বন্দনা। ভক্তিতে বিহ্বল হয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন তাঁকে। ব্রাহ্মণের ভক্তিতে পরিতুষ্ট সেই অপূর্ব পুরুষ অবশেষে কথা বললেন—যেন শত বেণুবীণা বেজে উঠলো একসঙ্গে।

(—আমি তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হয়েছি, ক্ষুদিরাম। পুত্ররূপে তোমার গৃহে জন্ম নেব আমি।

শরীর কাঁটা দিয়ে উঠলো ব্রাহ্মণের। তিনি বললেন, প্রভো, আমি দরিদ্র। কোনো দিন খেতে পাই, কোনো দিন পাই না। তুমি পুত্ররূপে আমার গৃহে আসবে, সে যে আমার শতজন্মের সৌভাগ্য। কিন্তু খাওয়াব কি তোমাকে? না প্রভো, তোমার আর আমার ছেলে হয়ে কাজ নেই।

—ভয় নেই ক্ষুদিরাম, সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। প্রসন্ন বদনে ভাবলেন সেই অমানব পুরুষ। আরো বললেন, তুমি যা দেবে তাই-ই আমি তৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করব। আমার এই অভিলাষে বাধা দিও না তুমি।

ব্রাহ্মণ আর কি বলবেন!

স্বপ্ন ভেঙে গেল।)

তিনি জেগে উঠলেন। তাঁর হৃদয়ে হয়েছে অপূর্ব শান্তির সঞ্চার। তাঁর বিশ্বাসী হৃদয় সায় দিলো—দেবস্বপ্ন কখনো বৃথা হয় না। নিশ্চয়ই কোনো মহাপুরুষ তাঁর গৃহে শীঘ্রই জন্ম নেবেন। ব্রাহ্মণ প্রশান্তচিত্তে দেশে ফিরলেন।

স্বপ্নের কথা কাউকে তিনি বললেন না। শুধু মনে মনে ভাবলেন, দেখি স্বপ্ন সত্যি হয় কি না। তারপর ইতিহাসের এক শুভ লগ্নে সেই বিচিত্র স্বপ্ন সত্য হোল, সার্থক হোল। যুগের প্রয়োজনে জন্মগ্রহণ করলেন যুগাবতার।

ছেলের কী নাম রাখা যায়?

আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পরসী কত রকমের নাম বলে। ক্ষুদিরামের মনে লাগে না সেসব নামের একটিও।

—তবে তুমিই একটা নাম ঠিক করো, বললেন একদিন চন্দ্রাদেবী)

স্বামীকে। নবজাত শিশুপুত্রটি তখন তাঁর কোলে। তার অনিন্দ্য মুখশ্রীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ক্ষুদিরামের মনে পড়ে যায় গয়ার বিষ্ণুমন্দিরে সেই স্বপ্নের কথা। আর ভাবতে হোল না ; নিমেষমধ্যে একটি নাম যেন তাঁর মানসপটে জ্বলন্ত অক্ষরে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আনন্দে আত্মহারা ব্রাহ্মণ তাঁর ব্রাহ্মণীকে বলেন—পেয়েছি, পেয়েছি, নাম পেয়েছি।

—কী নাম ?

—সুন্দর নাম—পতিতপাবন একটি নাম।

—অতো ভণিতা রাখো, বলোই না শুনি।

—গদাধর।

শিশু গদাধর যেন সকলের নয়নের মণি।

কামারপুকুরের সবারই মন কেড়ে নিয়েছে এই দেবশিশু।

পাড়ার মেয়েরা কাজকর্ম সেরে সময় পেলেই একবার আসে ক্ষুদিরামের বাড়িতে ; দেখে যায় তাঁর নবজাত পুত্রটিকে। কী অপরূপ সৌন্দর্য শিশুর—সকলেই প্রাণের টান অনুভব করে তাকে দেখে।

কিন্তু চিন্তিত হন ক্ষুদিরাম।

চন্দ্রাদেবীর মাতৃ-হৃদয়ও ভরে ওঠে দুশ্চিন্তায়।

কিসের চিন্তা ? কেমন করে তাঁরা শিশুপুত্রটিকে লালন-পালন করবেন—এই চিন্তা। ঘরে দুধ নেই যে দুধের বাছাকে একটু প্রাণভরে দুধ খাওয়াবেন। ক্ষুদিরামের এক ভাগ্নে রামচাঁদ থাকতো মেদিনীপুরে। তিনি যখন খবর পেলেন যে মামীর একটি ছেলে হয়েছে তখনি তিনি পাঠিয়ে দিলেন একটি দুগ্ধবতী গাভী। শুধু তাই নয়, রামচাঁদ সেই থেকে মাসে পনর টাকা করে পাঠাতে লাগলেন তাঁর মামাকে। ছেলেকে মানুষ করার দুশ্চিন্তা কিছুটা দূর হোল।

দিন যায়।

দেখতে দেখতে পাঁচমাস উত্তীর্ণ হোল।

এখন ছেলের মুখে ভাত দিতে হবে।

ক্ষুদিরাম ভেবেছিলেন রঘুবীরের প্রসাদী অন্ন ছেলের মুখে দিয়ে সামান্যভাবে তার অন্নপ্রাশনের কাজটা সারবেন। ঘটা করে করবার সঙ্গতিই বা কোথায় তাঁর? এমন সময়ে একদিন লাহাবাবু এলেন ক্ষুদিরামের কাছে। ধর্মদাস লাহা, গ্রামের জমিদার। ক্ষুদিরামের তিনি পরমবন্ধু।

—ঠাকুরমশাই, ছেলের অন্নপ্রাশনের কথা ভেবেছেন কিছু?

—ভেবে আর কি করব ভাই? রঘুবীরের প্রসাদী অন্ন মুখে দিয়ে নিয়ম রক্ষা করব।

—কেন? আমি রয়েছি কি জন্যে?

ক্ষুদিরামের মুখে আর কথা নেই। শুধু মনে জাগে—গয়ার সেই স্বপ্নের কথা। তিনি বলেছিলেন—"প্রভো, আমি গরীব বামুন, কোনোদিন খেতে পাই, কোনোদিন পাই না, তোমাকে কি খেতে দেব? না প্রভো, তোমার আর আমার ছেলে হয়ে কাজ নেই।" মনে পড়ে স্বপ্নে দেখা সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন—"তোমার কোনো ভয় নেই, সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।"

ছেলের জন্মের সময় থেকেই তিনি দেখছেন—সত্যিই সব বন্দোবস্ত হয়ে যাচ্ছে। আজ অন্নপ্রাশনের বন্দোবস্তও হয়ে গেল। লাহাবাবুই সব খরচ দিলেন। গ্রামের যত ব্রাহ্মণ সজ্জন আর ব্রাহ্মণেতর সকলেই ক্ষুদিরামের ছেলের অন্নপ্রাশনে পরিতৃপ্তির সঙ্গে প্রসাদ পেলেন। দরিদ্র ভিক্ষুকেরাও বাদ গেল না।

গদাধরের বয়স এখন পাঁচ বছর।

ছেলেকে এবার পাঠশালায় পাঠাতে হবে।

লাহাবাবুদের নাটমণ্ডপেই পাঠশালা বসত।

যথাসময়ে ক্ষুদিরাম ছেলের হাতেখড়ি দিয়ে তাকে পাঠশালায় ভর্তি করে দিলেন। মাথায় লম্বা চুল, ফুটফুটে রং, পাতলা গড়ন গদাধর যখন পাততাড়ি বগলে নিয়ে পাঠশালায় যেতেন তখন শিশুর মুখের অমিয়মাখা হাসি সকলের মন কেড়ে নিত। যে একবার দেখত সেই-ই মুগ্ধ হোত।

পাঁচবছরের ছেলের কী অপূর্ব আকর্ষণী শক্তি।

সমবয়সীরা তাঁকে পেলে আনন্দে মেতে উঠতো।

গদাই পাঠশালায় যায়। চন্দ্রাদেবী তার কাপড়ের খুঁটে মুড়ি বেঁধে দেন। সেই মুড়ি গদাধর তাঁর সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে খেতেন। পাঠশালা শেষ হোলে তাদের সঙ্গেই তিনি খেলাধূলা করতে... অল্পদিনের মধ্যেই গুরুমশাই বুঝলেন, গদাধর সাধারণ পড়ুয়ার মতোন নয়—সে রীতিমত শ্রুতিধর ও স্মৃতিধর ; যা একবার শোনে তাই-ই তার মনের মধ্যে গেঁথে যায়।

সেই বয়সেই গদাধরের যাত্রা শোনার প্রবল সখ দেখা গেল। কোথাও যাত্রা হবে শুনেছে কী আর স্থির নেই, যেমন করেই হোক সেখানে যাওয়া চাই। এইভাবে ছেলেবেলা থেকেই রামায়ণ, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি যাত্রা শুনতে শুনতে সেসব কাহিনী তাঁর কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল। সেসব শুধু মুখস্থ বলা নয়, একেবারে নিখুঁত অভিনয় করতে পারতেন। এইভাবে যাত্রাভিনয়ে গদাধর এমন দক্ষতা অর্জন করেছিলেন যে পাড়ার বর্ষিয়সী মহিলারা যখন বলতেন, গদাই এবার যাত্রা হোক—অমনি তিনি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে যাত্রা জুড়ে দিতেন।

অল্পদিনের মধ্যেই গদাধর বেশ লিখতে পড়তে সমর্থ হোলেন।

অঙ্কটা কিন্তু তেমন রপ্ত হোল না—নামতা কিছুতেই মনে থাকত না তাঁর। "অন্যদিকে বালকের অনুকরণ ও উদ্ভাবনী-শক্তি দিন দিন নানা নূতন দিকে প্রসারিত হইতে লাগিল। গ্রামের কুম্ভকারগণকে

দেবদেবীর মূর্তি গঠন করিতে দেখিয়া বালক তাহাদিগের নিকট যাতায়াত ও জিজ্ঞাসা করিয়া বাটীতে ঐ বিদ্যা অভ্যাস করিতে লাগিল, এবং উহা তাহার ক্রীড়ার অন্যতমরূপে পরিগণিত হইল।”

এইভাবে ছবি আঁকা আর পুতুল গড়া তিনি এমন সুন্দর শিখেছিলেন যে বলা যায় না। গদাধরের হাতের লেখা ছিল সুন্দর —একেবারে মুক্তার মতো। বাড়িতে পিতা আর ধর্মপরায়ণা মাতার জীবন্ত আদর্শ ছিল বালকের সম্মুখে, তাই বাল্যকালে তাঁর চরিত্র অমন সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে পেরেছিল। ক্ষুদিরাম রঘুবীর বিগ্রহের পূজা করতেন, চন্দ্রাদেবী তাঁর সেবা-পূজার আয়োজন করতেন—এ জিনিস প্রতিদিন দেখতেন গদাধর। রঘুবীরের এই মূর্তিটি তাঁকে এমনভাবে আকর্ষণ করতো যে তিনিও বাবার মতোন রঘুবীরের পূজো করবেন—এই রকম ইচ্ছা জাগতো তাঁর মনের মধ্যে। [illegible] না হোলে পূজায় অধিকার হয় না। গদাধর নিরস্ত হোলেন না; পূজোর ফুল তুলতে তো বাধা নেই। তিনি প্রত্যহ পূজোর সময়ে সাজিভরে ফুল তুলে দিতেন আর যতক্ষণ না পূজা শেষ হোত, কাছে বসে থাকতেন। পিতা কি রকম তন্ময় হয়ে পূজা করেন, বালক নিবিষ্টচিত্তে তা-ই লক্ষ্য করতেন।

একদিন বড়ো মজার ব্যাপার হোল।

ক্ষুদিরাম তন্ময় হয়ে রঘুবীরের পূজা করছেন। বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হয়ে তিনি ধ্যান করছেন। ঘরে আর কেউ নেই। এমন সময়ে গদাই পূজোর ঘরে প্রবেশ করলেন। দেখলেন, তাঁর বাবা পূজো করতে করতে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। সামনেই সাজানো রয়েছে পূজার নৈবেদ্য। গদাই মনের আনন্দে সেই নৈবেদ্য খেয়ে ফেললেন নিঃশব্দে। বিগ্রহের জন্য উদ্দিস্ট মালাগাছটা গলায় পড়লেন তারপর রঘুবীরের মূর্তিটা হাতে তুলে নিলেন আর নিজে বসলেন তাঁর আসনে। ক্ষুদিরামের তবু ধ্যান ভাঙে না।

—ও গো, ছাখো না, মালা পরে কেমন সেজেছি।

ক্ষুদিরামের ধ্যান ভেঙে যায়।

চোখ মেলে তিনি যা দেখলেন তাতে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। চকিতে মনে পড়ে স্বপ্নের কথা। ক্ষুদিরাম ছেলেকে কিছু বলেন না। এইতো সাক্ষাৎ গদাধর—মনে মনে ভাবেন তিনি।

গদাধরের বয়স যখন সাত বছর ছ'মাস তখন ক্ষুদিরাম মারা গেলেন। কামারপুকুরের এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে একটা দারুণ পরিবর্তন ঘনিয়ে আসে এইবার। রামকুমার বাড়ির বড়ো ছেলে; তাঁকেই এখন সংসারের হাল ধরতে হোল। তাঁর শোক করবার অবসর রইল না। তিনটি নাবালক ভাই-বোন আর শোকসন্তপ্তা বিধবা [illegible] ঁদের মুখ চেয়ে রামকুমার পিতৃবিয়োগ ব্যথা বিস্মৃত হোলেন।

দরিদ্রের সংসার আর চলে না।

ক্ষুদিরামের বড়োছেলে রামকুমার আয়ের নতুন পথ দেখবার জন্য কোলকাতায় যাবেন ঠিক করলেন। যাওয়ার আগে তিনি ছোটভাই গদাধরের পৈতে দিয়ে গেলেন।

গদাধর এখন উপবীতধারী কিশোর।

মায়ের মুখে তিনি শুনেছেন, তাঁদের গৃহদেবতা রঘুবীর কেমন করে কামারপুকুরের বাড়ীতে প্রথম আসেন এবং তখন থেকে ক্ষুদিরামের সংসারের অভাব দূর হয়। তখন থেকে গদাধর রঘুবীরকে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন। চন্দ্রাদেবী ছেলেকে বলতেন—এ বিগ্রহ জীবন্ত। উনি বলতেন, এমন জাগ্রত দেবতা ঘরে আসার পর থেকেই তো আমাদের দুঃখকষ্ট সব ঘুচে যায়। আগের মতোন অভাব আর থাকে না।

জাগ্রত দেবতা রঘুবীর।

গদাধরের মনে এই বিশ্বাস এখন আরো দৃঢ় হয়।

এখন তিনি উপবীতধারী। রঘুবীরকে তিনি এখন ছুঁতে পারেন, পূজো করতে পারেন। নতুন অনুরাগে পূর্ণ হয় কিশোর ব্রহ্মচারীর হৃদয়। "সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপ্ত করিয়া সে এখন নিত্য তাঁহার পূজা ও ধ্যানে বহুক্ষণ অতিবাহিত করিতে লাগিল এবং যাহাতে তিনি প্রসন্ন হয়ে পিতার ন্যায় তাঁহাকেও সময়ে সময়ে দর্শন ও আদেশ-দানে কৃতার্থ করেন, তজ্জন্য বিশেষ নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত তাঁহার সেবা করিতে লগিল।"

এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হোল।

গদাধরের বয়স এখন বারো বছর।

মেজভাই রামেশ্বরের বয়স বাইশ বছর আর ছোট বোন সর্বমঙ্গলা ন বছরে পড়লো। রামকুমার তখন রামেশ্বরের বিয়ে দিলেন ; ছোট বোনেরও বিয়ে দিলেন। রামেশ্বর কৃতবিদ্য, কিন্তু রোজগার কিছু করেন না। সংসারে পোষ্য আগের চেয়ে বেড়েছে, কিন্তু সেই অনুপাতে আয়বৃদ্ধি হয়নি। রামকুমার চিন্তিত হন। তাঁর স্ত্রীও এইসময়ে আসন্ন-প্রসবা। কিছুকাল পরে তাঁর স্ত্রী এক পরমসুন্দর পুত্র সন্তান প্রসব করে সূতিকাগারেই মারা যান। ক্ষুদিরামের সংসারে আবার শোকের ছায়া নামলো।

কিন্তু শোক চিরস্থায়ী ঘটনা নয়।

আগের মতোনই সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে হয় রামকুমারকে। তিনি বাড়ির জ্যেষ্ঠ সন্তান—দায়টা যে তাঁরই বেশি এখন। দিন দিন বিদায়-আদায় কমে যেতে লাগলো। সংসারে দেখা দেয় অর্থের অভাব। জমিতে আগের মতোই ধান হয় প্রচুর, কিন্তু শুধু ধান দিয়ে তো আর সংসার চলে না, কাপড় চাই, নিত্যকার দরকারী অনেক জিনিসই চাই—সেসব আসে কোথা থেকে ? সংসারে প্রতিদিন

অভাব বেড়েই চলেছে। মা বৃদ্ধা হয়েছেন, তাঁর জন্য দুধ দরকার; বাড়িতে মাতৃহীন একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু, তার জন্যেও দুধ দরকার। কোথায় দুধ মেলে? ক্রমে রামকুমারকে ঋণগ্রস্ত হতে হয়।

কিন্তু এইভাবে তো আর এতবড়ো সংসার চালানো সম্ভব নয়। রোজগারের উপায়ের কথা চিন্তা করেন রামকুমার। কোলকাতায় গেলে নাকি অর্থোপার্জন সম্ভব; অনেকে এই পরামর্শ দিলেন তাঁকে। সিহড়ের মহেশ চাটুয্যে, দেশড়ার রামধন ঘোষ—তাঁর পরিচিত অনেকেই তখন কোলকাতায় গিয়ে টাকা রোজগার করে নিজের নিজের সংসার গুছিয়ে নিয়েছেন। তিনিই বা পারবেন না কেন? তাঁর পেটে তো বিদ্যেবুদ্ধি আছে। বন্ধুদের এইরকম সদুপদেশ শুনে অবধি রামকুমার ভাবেন—তাহোলে কোলকাতায় গিয়েই ভাগ্য-পরীক্ষা করি। তারপর একদিন রামেশ্বরের ওপর সংসারের ভার দিয়ে তিনি এলেন কোলকাতায়। ঝামাপুকুরে রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়ির কাছেই একটা টোল খুললেন। ছাত্রের অভাব হোল না।

—মা, গদাইটা দেখছি ভবঘুরে হয়ে গিয়েছে, একদিন কোলকাতা থেকে এসে রামকুমার মা-কে এই কথা বললেন। কথাটা মিথ্যা নয়। তখন গদাধরের বয়স ষোল বছর। তিনি কোলকাতায় চলে যাওয়ার পর থেকে কনিষ্ঠের লেখাপড়ায় অমনোযোগিতা আর ধর্মচর্চায় অনুরাগ কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে—মায়ের মুখে আর রামেশ্বরের কাছে তার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে রামকুমার একটু চিন্তিত হোলেন।

—বুঝলে মা, এখানে থাকলে গদা মানুষ হবে না; ওকে বরং আমি কোলকাতায় নিয়ে যাই। তুমি কি বলো?

—আমি আর কি বলব? তুমি এখন সংসারের কর্তা; যা ভাল বুঝবে তাই করবে। তবে গদাইকে একটু চোখে চোখে রাখিস।

—সেজন্যে তুমি ভেবো না, মা।

ষোল বছর বয়সে তাঁর প্রিয় কামারপুকুর ত্যাগ করে গদাধর এলেন কোলকাতায়। অগ্রজকে তিনি পিতার মতোই ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। তাঁরই ঝামাপুকুরের টোলে এসে উঠলেন তিনি। টোলের অধ্যাপনা ছাড়াও, লোকের বাড়িতে ক্রিয়াকর্মে রামকুমারের ডাক পড়তো। তাতে বিদায়-আদায় মন্দ হোত না। এইটাই ছিল প্রধান আয়।

রামকুমার অত্যন্ত স্বধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। জ্যোতিষ আর স্মৃতিশাস্ত্র —এই দু'টি বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল। দিগম্বর মিত্রের বাড়িতে দেবসেবার ভার পেয়েছিলেন রামকুমার। আরো কয়েকটা সঙ্গতিসম্পন্ন ঘরে ঐরকম কাজ পেয়েছিলেন তিনি। টোলে ছাত্র পড়ানো, এবং এতগুলি বাড়িতে নিত্য দেবসেবা করা—একা রামকুমার যেন আর পেরে উঠছিলেন না, অথচ ছাড়তেও পারেন না। তাই একদিন তিনি ছোটভাইকে বললেন, গদাই, এখন থেকে তুই দুই-এক বাড়িতে দেব-সেবার কাজটা কর।

গদাধর যেন হাতে চাঁদ পেলেন।

অগ্রজের আদেশটা তাঁর মনের মতোন হোল।

কামারপুকুর থেকে কোলকাতায় এসে অবধি তিনি যেন হাঁফিয়ে উঠেছিলেন। সেখানে ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ, এখানে তেমন সুবিধে নেই। শহর জায়গা, এখানকার আদব-কায়দাই যে আলাদা। ভাইকে কাছে এনে রামকুমার প্রথমে ভেবেছিলেন তাকে সংস্কৃত পড়াবেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে তিনি দেখলেন গদাধর সেসব কথা যেন কানে তুলতেই চান না। বেশি পীড়াপীড়ি করলে বলতেন, দাদা, ও চাল-কলা-বাঁধা বিদ্যেয় আমার কাজ নেই।

—কাজ নেই ত বুঝলাম, কিন্তু তুই এখন বড়ো হয়েছিস, একটা কিছু কাজ তো করতে হবে, নইলে সংসার চলবে কি করে?

— রঘুবীরের সংসার কি অচল থাকে, দাদা? সরল মনে উত্তর দেন সরলতার প্রতিমূর্তি গদাধর।

এরপরই রামকুমার কনিষ্ঠকে কয়েক বাড়িতে দেব-সেবার কাজের ভার দিলেন। তিনিও হৃষ্টচিত্তে সেই ভার নিলেন। দেবমানবের যোগ্য কাজ এই দেব-সেবা। প্রিয়দর্শন কিশোর অল্পদিনের মধ্যেই নিজগুণে যজমানপরিবারবর্গের সকলের প্রিয় হয়ে উঠলেন। কামারপুকুরের মতোন এখানকার সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুরনারিগণ তাঁর সরল ব্যবহার, মিষ্টি কথা আর ঈশ্বরে ভক্তি দেখে নিঃসঙ্কোচে তাঁকে তাঁদের অন্তঃপুরে আদর করে ডেকে পাঠাতেন। তাঁর মধুর কণ্ঠের গান শুনে পুরমহিলাদের আনন্দের সীমা ছিল না।

কয়েক মাস পরে একদিন রামকুমার ভাইকে স্নেহভরে বললেন, হ্যাঁরে, এমনি করেই তোর দিন যাবে? একবারেই পড়াশুনা করবি না? আদ্য-মধ্যটা অন্তত পাশ দে। উপাধি না হয় না পাশ করলি।

—দাদা, বলেছি তো, তোমাদের ঐ চাল-কলা-বাঁধা বিদ্যেয় আমার কাজ নেই। আমি চাই আসল জ্ঞান।

—ওসব কথা রাখ, গদাই। এখন তুই ছোট আছিস। একদিন বড়ো হবি, সংসার করবি। নিজের ভবিষ্যৎটা যদি নিজে না ভাবিস তা হোলে পস্তাবি।

বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে তর্ক করতে মন চায় না, চুপ করে থাকেন গদাধর। রামকুমারও বেশি জোর দিয়ে বলতে সাহস পান না, কেননা গদাই যে মায়ের বড়ো আদরের ছেলে। তিনি এখন বুঝলেন অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষায় এতটুকু আগ্রহ নেই কনিষ্ঠের।

আরো দু'বছর কেটে গেল এইভাবে।

রামকুমারের আর্থিক অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়, দেনা বেড়ে চলে। টোল বন্ধ করে, অন্য কোনো কাজ করবেন কি না তা চিন্তা করেন। কিন্তু আর কি কাজই বা তিনি জানেন যে করবেন? যজন-যাজন আর অধ্যাপনা—এ ছাড়া আর কোনো কাজই তো তিনি

শেখেন নি। আর নতুন করে অর্থকরী কোনো বিদ্যা শিখবেন, এ বয়সে তাও সম্ভব নয়। গৃহদেবতা রঘুবীর আর ধর্মপ্রাণ পিতার পূণ্যবল এই ভরসা করে রামকুমার যখন দিনাতিপাত করছিলেন তখন একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে রাণী রাসমণির নিমন্ত্রণ এলো তাঁর কাছে। সে কথা আগেই বলেছি।

৩

যেদিন দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়, সেদিন রামকুমার তাঁর কনিষ্ঠ গদাধরকে সঙ্গে করে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ঠাকুর বলতেন, রাণী রাসমণি যে রকম ধূমধাম করে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, স্মরণাতীত কালের মধ্যে বাংলাদেশে অমন ধূমধাম করে আর কেউ কোথায় কোনো মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন বলে শোনা যায় নি।

"প্রতিষ্ঠার পূর্বদিনে যাত্রা, কালীকীর্তন, ভাগবতপাঠ, রামায়ণকথা ইত্যাদি নানা বিষয়ে কালীবাটীতে আনন্দের প্রবাহ ছুটিয়াছিল। রাত্রিকালেও ঐরূপ আনন্দের বিরাম হয় নাই অসংখ্য আলোকমালায় দেবালয়ের সর্বত্র দিবসের ন্যায় উজ্জ্বলভাব ধারণ করিয়াছিল। ঠাকুর বলিতেন ঐ সময় দেবালয় দেখিয়া মনে হইয়াছিল, রাণী যেন রজতগিরি তুলিয়া আনাইয়া এখানে বসাইয়া দিয়াছেন।"

রাণীর অনেক সুকৃতি ছিল যে, রামকুমারের মতোন একজন আচারপরায়ণ, স্বধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে পূজকরূপে পেলেন। মহাসমারোহে শ্রীশ্রীজগদম্বা শুভ স্নানযাত্রার দিনে নতুন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হোলেন। সেদিন 'দীয়তাং ভূজ্যতাং'—দাও আর খাও—শব্দে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরপ্রাঙ্গণ দিনরাত সমানভাবে কোলাহলে ভরে উঠেছিল। রাণী অর্থব্যয় করলেন অকাতরে। মুক্তহস্তে সকল প্রার্থীর অভিলাষ পূর্ণ

করলেন। অতিথি অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করতে চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। সুদূর কান্যকুব্জ, বারাণসী, নবদ্বীপ, শ্রীহট্ট, উড়িষ্যা প্রভৃতি পণ্ডিতপ্রধান জায়গা থেকে এলেন কত অধ্যাপক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সমাগত ব্রাহ্মণগণ প্রত্যেকে একখানি করে রেশমি বস্ত্র, চাদর এবং বিদায়-দক্ষিণা হিসাবে একটি করে মোহর পেলেন। মন্দির তৈরি আর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রাণী খরচ করেছিলেন ন' লক্ষ টাকা। আর এই দেবসেবা যাতে চিরকাল নির্বিঘ্নে চলতে পারে তারো ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন—আড়াই লক্ষ টাকার একটি জমিদারী দেবসেবার জন্য দানপত্র লিখে দিলেন। এমন পরিপাটিভাবে মন্দির প্রতিষ্ঠা আর কেউ কখনো করেনি। এই মন্দিরপ্রতিষ্ঠা করে রাণী রাসমণি সত্যই এক অবিনশ্বর কীর্তি স্থাপন করে গিয়েছেন। যা ছিল একসময়ে মুসলমানদের কবরডাঙা আর পীরের স্থান, সেইখানে উঠলো নবরত্নবিশিষ্ট বিশাল সুউচ্চ এক মন্দির। গঙ্গা তীরে জেগে উঠলো ভারতের এক নতুন তীর্থ– দক্ষিণেশ্বর। তারপর কালক্রমে এক সাধকের অলৌকিক সাধনায়, সেই তীর্থ কি রকম প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল, এইবার আমরা সেই কাহিনী বলব।

মন্দির প্রতিষ্ঠার পর ছ-সাত দিন কেটে গেল।

রামকুমার দক্ষিণেশ্বর থেকে ফিরলেন না।

উৎকণ্ঠিত গদাধর নিজেই এলেন দক্ষিণেশ্বরে। এসে দেখলেন, তাঁর অগ্রজ ভবতারিণীর নিত্যপূজায় ব্রতী হয়েছেন। কনিষ্ঠ কিঞ্চিৎ বিস্মিত হোলেন। অশূদ্রগ্রাহী ও অশূদ্রযাজী ক্ষুদিরামের বংশে এ জিনিস ছিল কল্পনাতীত। গদাধর ভেবেছিলেন, দাদা বিধান দিয়েছেন আর প্রতিষ্ঠার দিন পূজা-অর্চনার ভার নিয়েছিলেন, তারপর তিনি নিশ্চয়ই চলে আসবেন।

—আপনি কি এখানকার নিত্যপূজায় ব্রতী হয়েছেন?

—হ্যাঁ।

—কাজটা কি অশাস্ত্রীয় নয় ?

—আমাদের অভাবের সংসার, কোনো স্থায়ী আয় নেই। এখানে একটা স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা আছে আর রাণীর জামাই মথুরানাথ আমাকে খুব ভালবাসেন।

—বাবা কখনো শূদ্রের ভাত খাননি, আপনি কেন এমন কাজ করলেন ?

—লৌকিক মতে আমার এ আচরণ নিন্দনীয় হোতে পারে। তবে এ কাজ ধর্মবিরুদ্ধ নয়।

—ধর্মবিরুদ্ধ নয় ?

—না, ধর্মবিরুদ্ধ নয়। আমি শাস্ত্রের প্রমাণ দেব। রাণী রাসমণি যে জাতেরই হোন, এ দেবালয় তাঁর গুরুদেবের নামে প্রতিষ্ঠিত। অতএব এ মন্দিরে এখন তাঁর গুরুদেবেরই অধিকার। কাজেই আমি এখন যে মন্দিরে পূজা করছি, সেটা কৈবর্তের নয়, ব্রাহ্মণের, আমার কাজটা ধর্মবর্হিভূত নয়।

—আপনার কথা ঠিক মানতে পারলাম না, দাদা।

—শাস্ত্র তুই আর কতটা বুঝিস। ওসব কথা এখন থাক। আজ যখন এসেছিস তখন মায়ের প্রসাদ খেয়ে যাস।

—আমি প্রসাদ খাবো না। সেদিনও খাইনি, আজো খাব না।

—দেবালয়, গঙ্গাজলে রান্না, জগদম্বাকে নিবেদন করা হয়েছে, এ খেলে কোনো দোষ হবে না।

গদাধর শুনলেন না। তিনি সিদে নিয়ে গঙ্গার ধারে নিজের হাতে রান্না করে খেলেন। সেদিন তিনি আর ঝামাপুকুরে ফিরলেন না।

গদাধর বুঝলেন, তাঁর দাদা রাণীর ঐকান্তিক অনুরোধে চিরকালের জন্য জগদম্বার পূজকের পদে ব্রতী হোতে রাজী হয়েছেন। এখন তাঁর মনে একটি চিন্তার উদয় হোল, চতুষ্পাঠী এবার উঠে যাবে। চতুষ্পাঠী

উঠে গেলে তিনি এখন কি করবেন? গদাধর দক্ষিণেশ্বরেই রয়ে গেলেন। ঠিক এমনি সময়ে তাঁদের এক ভাগ্নে—হৃদয়রাম মুখুয্যে—চাকরির খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হোলেন।

হৃদয় গদাধরের থেকে চু'বছরের ছোট ছিলেন।

এখানে এসে সমবয়সী মাতুলকে পেয়ে তাঁর খুব আনন্দ হোল। —মেজমামা বেশ কাজটা পেয়েছেন, ওঁকে বলো রাণীর সেরেস্তায় আমার একটা চাকরি করে দিতে। একদিন বললেন হৃদয় কথাটা গদাধরকে।

—তোর ইচ্ছে হয়, তুই বল্‌গে যা। উত্তর দিলেন গদাধর।

কিছুদিন গেল।

কামারপুকুরের বাড়ির মতোন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িও গদাধরের আপনার হোয়ে উঠলো। হবেই বা না কেন? গঙ্গার তীরে পঞ্চবটীশোভিত বাগান, সে বাগানে অসংখ্য পাখীর কলরব, সুবিশাল দেবালয়, সেখানে ভক্তির সঙ্গে নিত্য দেবসেবা, সদাচারী অগ্রজের অকৃত্রিম স্নেহ—এই দেখে গদাইরের মন ভরে উঠতো। শুধু এই নয়, সেখানে তাঁকে আকর্ষণ করবার মতোন আরো চুটো জিনিস ছিল—ভক্তিমতী রাণী রাসমণি আর তাঁর ভক্তিমান জামাই মথুরানাথ। দেবদ্বিজে রাণীর ভক্তি দেখে গদাধর অবাক হোয়ে যেতেন। তাঁর দাদা শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ—তিনি যে সহজে এমন অশাস্ত্রীয় কাজ করবেন, এটা অসম্ভব। দাদার যুক্তিই ঠিক—রাণীর হৃদয়ে ভক্তি দেখে এই সিদ্ধান্ত করলেন গদাধর। প্রথম ক'দিন নিজের হাতে রেঁধে খেলেন, তারপর প্রসাদী অন্নগ্রহণে তাঁর আর কোনো আপত্তি রইল না।

গদাধর এখন আছেন দক্ষিণেশ্বরে মনের আনন্দে।

ভাগ্নে হৃদয়রাম এখানে আসার পর থেকে তাঁর দিনগুলি সুখেই অতিবাহিত হয়। কোনো ভাবনা চিন্তা-নেই ; দাদা পূজো করেন, ভাই মন দিয়ে সেসব লক্ষ্য করেন আর মনে মনে ভাবেন একদিন তিনিও কি তাঁর দাদার মতোন দেবী ভবতারিণীর পূজা করবেন না ? গদাধর জানতেন না যে পষাণময়ী দেবী তাঁরই জন্য অপেক্ষা করছেন। জানতেন না যে, এই নতুন দেবালয়, এই দেবীমূর্তির স্থাপনা—এ সবই যে তাঁরই জন্য হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে তাঁকে কেন্দ্র করেই যে একদিন দক্ষিণেশ্বরে শুরু হবে যত মত তত পথের বিচিত্র সাধনা।

গদাধরের বয়স এখন কুড়ি বছর কয়েক মাস।

হৃদয়কে সহচর পেয়ে তাঁর দক্ষিণেশ্বরে বাস এখন সহজ হোল। মামা-অন্ত প্রাণ ছিল হৃদয়ের। তার পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন গদাধরের সাধক জীবনে। মামা-ভাগ্নে দুটিতে একসঙ্গে বেড়ানো, শোয়া, বসা সব কাজই হোত। হৃদয় যেমন গদাধরের প্রিয়, গদাধর তেমনি ছিলেন হৃদয়ের হৃদয়। একদিন রাতে প্রসাদী লুচি খেতে খেতে গদাধর তার ভাগ্নেকে জিজ্ঞাসা করেন, হ্যাঁরে হৃদু, তোর কি মনে হয় আমি কৈবর্তের অন্ন খাচ্ছি ?

—ও কথা মনেও স্থান দিও না, মামা। এ সাক্ষাৎ জগদম্বার প্রসাদ।

— তুই বিশ্বাস করিস ?

—করি।

মাঝে মাঝে গদাধরকে খুঁজে পাওয়া যেত না।

হৃদয় যখন তার জ্যেষ্ঠ মাতুলকে কোনো বিষয়ে সাহায্য করতে যেতেন, কিংবা দুপুরে খাওয়ার পর একটু ঘুমিয়ে নিতেন, অথবা সন্ধ্যাবেলায় মন্দিরে আরতি দেখতে যেতেন, তখন কিছুক্ষণের জন্য গদাধর কোথায় যেন হাওয়া হয়ে যেতেন, খুঁজে পাওয়া যেত না। হৃদয় ব্যাকুল হয়ে খোঁজাখুজি করেন। ঘণ্টা দুই-তিন বাদে গদাধর

যখন ফিরতেন পঞ্চবটীর দিক থেকে, হৃদয় ভাবতেন মামা বোধহয় শৌচাদির জন্য ঐদিকে গিয়েছিলেন। তখন তিনি আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতেন না।

এইসময়ে একদিন গদাধরের ইচ্ছা হোল, তিনি শিবপূজো করবেন। ছেলেবেলায় কামারপুকুরে তিনি কখনো কখনো ঐরকম করতেন। ইচ্ছাময় পুরুষ তিনি। ইচ্ছা হওয়ামাত্র গঙ্গা থেকে খানিকটা নরম মাটি তুলে নিয়ে এলেন; তাই দিয়ে আপনমনে নিজের হাতে তৈরি করলেন শিবমূর্তি, ষাঁড়, ডমরু ও ত্রিশূলটা পর্যন্ত বাদ গেল না। নিজের হাতে গড়া মূর্তি নিজেই পূজো করলেন। তন্ময় হয়ে পূজো করছেন তিনি, এমন সময়ে বেড়াতে বেড়াতে সেখানে এসে উপস্থিত হোলেন মথুরবাবু।

মূর্তি দেখে তাঁর বিস্ময়ের সীমা নেই।

বাজারে তো এমন সুন্দর শিবমূর্তি পাওয়া যায় না, মনে মনে ভাবেন মথুরানাথ। এমন দেবভাবময় মূর্তি কে গড়লো? জানবার কৌতূহল হয় তাঁর; জিজ্ঞাসা করেন হৃদয়কে—এ মূর্তি কোথায় পেলে? কে গড়েছে?

—ছোটমামা। উনি যে খুব ভাল মূর্তি গড়তে জানেন। ভাঙা মূর্তিও জুড়তে জানেন।

—বটে! পূজো হয়ে গেলে এটা আমাকে দিয়ে দিতে বোলো।

মথুরবাবু চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ বাদে পূজা শেষ হোল।

—মামা, মূর্তিটা সেজবাবু চেয়ে গিয়েছেন। দাও, তাঁকে দিয়ে আসি এটা।

গদাধর আপত্তি করলেন না।

মূর্তি হাতে পেয়ে মথুরবাবু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখে তাঁর যেন তৃপ্তি হয় না। মুগ্ধ হয়ে তিনি রাণীকে

সেটা দেখতে দিলেন। রাণীও দেখে মূর্তিটির খুব প্রশংসা করেন এবং বড়ো ভট্টাচার্যির ভাই এটা গড়েছেন জেনে তাঁর যেন বিস্ময়ের সীমা রইল না।

—তা হোলে ছোট ভট্‌চাজকে মন্দিরের কাজে নেওয়া যাক, কি বলুন, জিজ্ঞাসা করলেন মথুরানাথ।

—চেষ্টা করে দেখতে পারো, ভালই হবে।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের একটু বর্ণনা দিই এখানে।

১৮৫৫ সনের রথযাত্রার দিন যে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়, কালক্রমে তার খ্যাতি সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে। আজ কাশী, বৃন্দাবন, গয়া বা পুরীর জগন্নাথের মন্দিরের মতোনই দক্ষিণেশ্বরের মন্দির ধর্মপ্রাণ যাত্রীদের আকর্ষণ করে। রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত এই কালী ড়ি কোলকাতা থেকে পাঁচ মাইল দূরে গঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত। "গঙ্গার পশ্চিমকূল, বারাণসী সমতুল"—রাণীর তাই খুব ইচ্ছা ছিল যে, ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে কোনো একটা স্থানে এই মন্দির করবেন। কিন্তু যখন অনেক চেষ্টা করেও পশ্চিমতীরে মনের মতোন একটা জায়গা তিনি খুঁজে পেলেন না, তখন রাণী বাধ্য হয়ে পরিশেষে গঙ্গার পূর্বতীরে এই জায়গাটা কিনলেন।

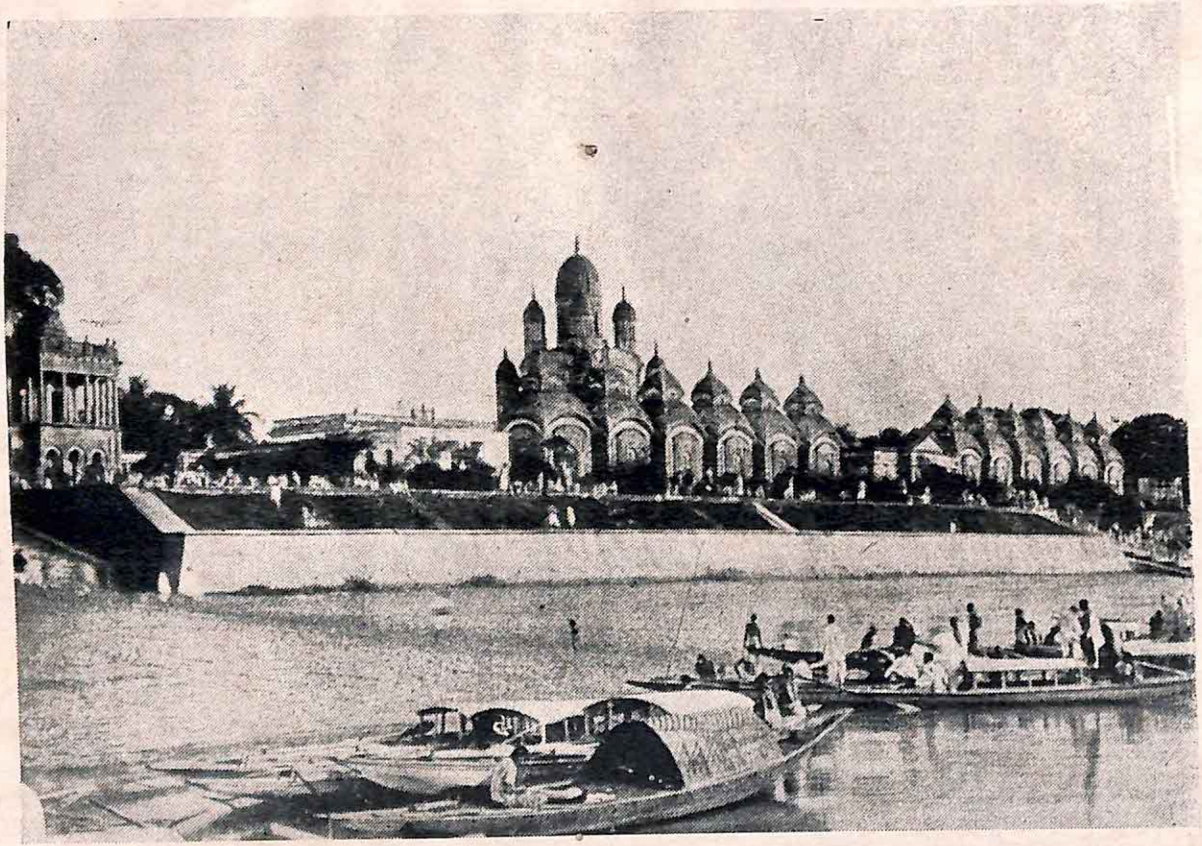
শোনা যায়, দক্ষিণেশ্বরে যে স্থানটি রাণী মনোনীত করেন, তার একধারে মুসলমানদের কবরডাঙা ও গাজিসাহেবের পীরের আস্তানা ছিল আর এর কিছু অংশের মালিক ছিলেন এক সাহেব। কাছিমের পিঠের মতোন দেখতে ছিল জায়গাটা। আমাদের তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, কূর্মপৃষ্ঠাকৃতি শ্মশানই শক্তি প্রতিষ্ঠা ও সাধনার জন্য বিশেষ প্রশস্ত। রাণী তাই এই জায়গাটা পছন্দ করেছিলেন। ষাট বিঘে জমি কিনে তার ওপর মন্দিরের কাজের পত্তন হয়। বিরাট

মন্দির, অতিথিশালা, দ্বাদশ শিবমন্দির প্রভৃতি তৈরি করতে দু'বছর সময় লেগেছিল।

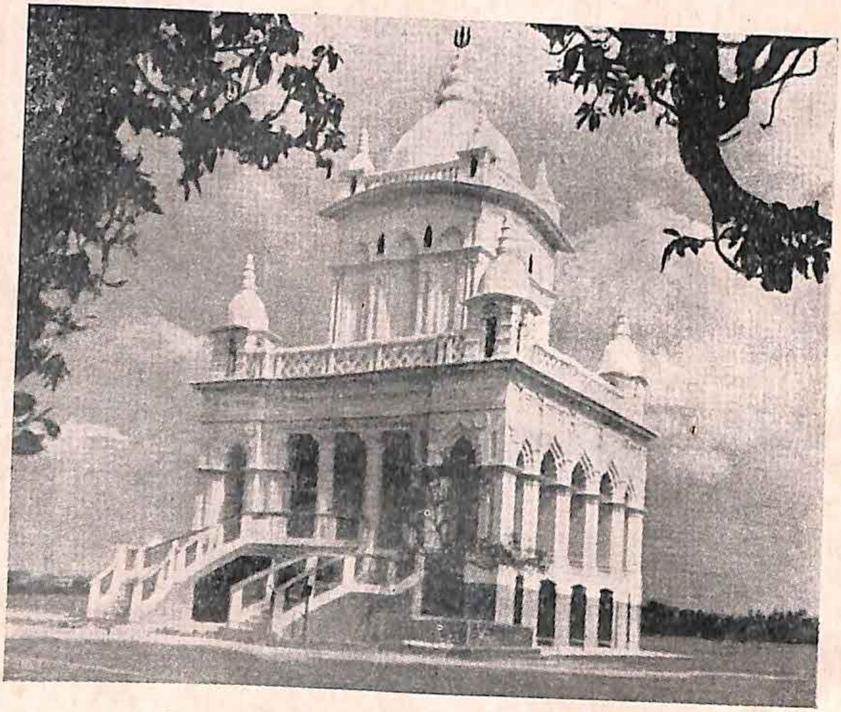
কোলকাতা থেকে যাঁরা নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি যান, তাঁরা প্রথমেই অবতরণ করেন বিস্তীর্ণ সোপান শ্রেণীতে। সেই সিঁড়ি যেখানে শেষ হয়েছে সেইটা চাঁদনী। চাঁদনীর দুই পাশে, উত্তরে ও দক্ষিণে ছয়টা ছয়টা করে দ্বাদশটি শিবমন্দির। চাঁদনী ও দ্বাদশ শিবমন্দির পার হোয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে আসতে হয়। প্রাঙ্গণের মাঝখানে ঠিক একই সারিতে দুইটি মন্দির। উত্তরদিকে রাধাকান্তের এবং দক্ষিণদিকে মা ভবতারিণীর মন্দির।

রাধাকান্তের মন্দিরে শ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ পশ্চিমদিকে মুখ করে বিরাজ করছেন। দক্ষিণে মন্দিরে পাষাণময়ী কালীপ্রতিমা। ইনিই দক্ষিণেশ্বরের ইষ্টদেবী মা ভবতারিণী। শাদা আর কালো মার্বেল পাথর দিয়ে আগাগোড়া হর্ম্যতল আবৃত, উঁচু বেদী। বেদীর উপর রূপোর একটা সহস্রদল পদ্ম, তার ওপর দক্ষিণদিকে মাথা রেখে শাদা পাথরের তৈরি শিব শবরূপে শয়ন করে আছেন। তাঁর বুকের উপর দক্ষিণদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন দেবী ভবতারিণী। সুন্দর ত্রিনয়নী শ্যামাকালীর এই প্রস্তরময়ী মূর্তিটির সর্বাঙ্গে ঝলমল করছে কত স্বর্ণ-অলঙ্কার।

কালীমন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির। নাটমন্দিরের উপরে মহাদেব ও নন্দী-ভৃঙ্গী। চকমিলান উঠানের তিনদিকে একতলা ঘরের সারি। পূর্বদিকের ঘরগুলির মধ্যে ভাঁড়ার ঘর, লুচিঘর, বিষ্ণুর ভোগঘর, নৈবেদ্যঘর, মায়ের ভোগঘর ও ঠাকুরদের রান্নাঘর ও অতিথিঘর। দক্ষিণের ঘরগুলিতে দপ্তরখানা ও কর্মচারীদের থাকবার জায়গা। উত্তরে একতলা ঘরের ঠিক মাঝখানে দেউড়ি। উঠানের ঠিক উত্তর-পশ্চিম-কোণে অর্থাৎ দ্বাদশ শিবমন্দিরের ঠিক উত্তরে গদাধরের ঘর। ঘরের ঠিক পশ্চিমে অর্ধেক গোল একটি বারান্দা, এই বারান্দার পরেই



ভাগীরথীতীরে ভারতের নতুন তীর্থ—দক্ষিণেশ্বর



বিবেকানন্দ মন্দির, বেলুড় মঠ

পথ। তার পশ্চিমে ফুলের বাগান। ফুলের বাগান পার হোলেই গঙ্গাতীরের পোস্তা। ঘরের উত্তরেও একটি রাস্তা আছে। রাস্তার উত্তরে বাগান আর বাগানের উত্তরে নহবৎ। নহবতের উত্তরে বকুলতলার ঘাট। এই ঘাটের ঠিক উত্তর দিকেই জঙ্গলাবৃত অসমান ভূমি, কবর ডাঙা আর গভীর ঝাউগাছের বন।

এইবার আমরা দেখব গঙ্গার তীরে, এই মনোরম স্থানে, বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা এক নিরক্ষর সাধকের ধ্যানের মধ্যে কেমন করে এসে মিললো। দেখব কেমন করে তাঁর অলৌকিক সাধনার জ্যোতি ধীরে ধীরে ফুটে উঠলো শতাব্দীর পটে আর কেমন করেই বা ধর্মজগতে তিনি নিয়ে এলেন এক অকল্পিত যুগান্তর।

৪

—গদাই চাকরি করবি ?

—কোথায় ? কি চাকরি ?

—দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে। সেজবাবু বলছিলেন আমাকে। হৃদুকেও একটা চাকরি দেবেন বলেছেন।

মন্দির প্রতিষ্ঠার কয়েক সপ্তাহ পরের কথা। একদিন রামকুমার তাঁর কনিষ্ঠ সহোদরকে এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন। গদাধরের সৌম্য আকৃতি, কোমল প্রকৃতি, ধর্মনিষ্ঠা আর অল্পবয়স রাসমণি ও তাঁর জামাই মথুরানাথের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করলো। তার ওপর তাঁর হাতের তৈরি সুন্দর শিবমূর্তিটি দেখবার পর তাঁরা ঐ কিশোরকে মন্দিরের পূজার কাজে নিযুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং রামকুমারকে ঐ কথা বলেন।

—কিন্তু আমি যে ভগবান ছাড়া আর কারো চাকরি করব না, ঠিক করেছি, দাদা।

রামকুমার আর কিছু বললেন না। মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হোলেন। এমন চাকরি কেউ পায়ে ঠেলে ফেলে দেয় ? গদাইয়ের যেন সবই অদ্ভুত। মা, আমাকে কৈবর্তের অন্ন খাওয়ালি ?—প্রসাদী লুচি খেয়ে একদিন এইরকম মন্তব্য করেছিলেন তিনি। কথাটা অগ্রজের কানে গেলে তিনি সেদিন ভাইকে বুঝিয়ে বলেছিলেন—আমি তো শাস্ত্র

তোর চেয়ে বেশি বুঝি, এটা মানিস তো? আমি যদি বিধান দিতে পারি, পূজারীর কাজ নিতে সম্মত হই, তা'হোলে তোর মনে এ রকম সংকীর্ণ ভাব কেন? ভোগ নিবেদন করার পর কৈবর্তের অন্ন হয় কি করে? রাণীর অন্তরের ভক্তিটা দেখতে পেলি না, তাঁর জাতটা-ই দেখলি?

সেদিন রামকুমারের কথাগুলো, মনে হয়, গদাধরের অন্তর স্পর্শ করেছিল। তবু মন্দিরের চাকরি গ্রহণ করা সম্পর্কে তিনি তখনি মনস্থির করতে পারলেন না। এমন সময়ে একদিন মথুরবাবু কালীমন্দিরে দর্শনাদি করে ফিরবার পথে কিছু দূরে গদাধরকে দেখতে পেলেন। তাঁকে তিনি ডেকে পাঠালেন। গদাধরও মথুরবাবুকে এড়িয়ে চলতেন। ঐ দিন হৃদয়ের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে সেজবাবুকে দূরে দেখতে পেয়ে সেখান থেকে সরে অন্যত্র যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে মথুরের ভৃত্য এসে সংবাদ দিল, বাবু আপনাকে ডাকছেন।

গদাধর ইতস্তত করেন।

—মামা, যাও না একবার।

—তুই জানিসনে হৃদু, গেলেই আমাকে এখানে থাকতে বলবে, চাকরি নিতে বলবে।

—তাতে দোষ কি? এমন লোকের কাছে চাকরি পাওয়া তো ভাগ্যের কথা।

—আমার যে চাকরিতে আবদ্ধ হোতে ইচ্ছা নেই।

—কেন?

—দেখিসনি, মায়ের গা-ভর্তি কতো গয়না। পূজা করতে স্বীকার করলে ঐসব গয়নার জন্যে দায়ী থাকতে হবে, সে বড়ো হাঙ্গামার কথা। আমাকে দিয়ে ওসব সম্ভব হবে না।

—তবে এমন চাকরি হাতে পেয়ে ছেড়ে দেবে তুমি?

—তাইতো ভাবছি। আচ্ছা হৃদু, তুই আমার সঙ্গে আয়,

সেজবাবুকে বলবো যাতে তিনি তোকেও একটা চাকরি দেন। তুই কাজের ভার নিয়ে আমার সঙ্গে থাকলে, আমার পূজো করতে আপত্তি নেই।

হৃদয় তো চাকরির খোঁজেই এখানে এসেছিল।

গদাধরের কথায় সে আনন্দে স্বীকৃত হোল।

তিনি মথুরের কাছে এসে বললেন—হৃদুকে যদি একটা কাজ দিতে পারেন, তা'হোলে আমি রাজী আছি।

মথুর স্বীকৃত হোলেন। ঐদিন থেকে তিনি গদাধরকে কালী-মন্দিরে পূজারীর পদে এবং হৃদয়কে রামকুমার ও তাঁকে সাহায্য করতে নিযুক্ত করলেন। অতঃপর রামকুমার নিশ্চিন্ত হোলেন।

মন্দির প্রতিষ্ঠার তিনমাস পরের কথা।

রাধাকান্তের পূজারী ছিলেন ক্ষেত্রনাথ চটোপাধ্যায়। প্রত্যহ হুপুরবেলায় পূজা ও ভোগরাগাদি হয়ে গেলে তিনি বিগ্রহকে শয়ন দেওয়ার জন্য পাশের একটি ঘরে নিয়ে যেতেন। সেদিন কৃষ্ণ-মূর্তিটি নিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ শ্বেতপাথরের পেছল মেঝেতে পূজারী পা পিছলিয়ে পড়ে গেলেন। বিগ্রহের একটা পা ভেঙে গেল। ঘটনাটা ঘটলো ভাদ্র মাসের জন্মাষ্টমীর পরের দিন। অমঙ্গল আশঙ্কা করে রাণী ও মথুরানাথ হুজনেই হুশ্চিন্তাগ্রস্ত হোলেন। অনবধনতার অপরাধে পূজারী ক্ষেত্রনাথ হোলেন কর্মচ্যুত।

কিন্তু তাতে সমস্যা মিটল না।

ভাঙা মূর্তিতে পূজা সম্ভব কি না, তা জানতে না পারায় রাধা-কান্তের পূজা বন্ধ হয়ে গেল। উপায়? রাণীর নির্দেশে মথুরানাথ পণ্ডিতদের কাছে ব্যবস্থা চেয়ে পাঠালেন। দক্ষিণেশ্বরে পণ্ডিতদের সভা বসলো। শাস্ত্র খুলে সকলে বিধান দিলেন—ভাঙা মূর্তিতে পূজা চলতে পারে না। এ বিগ্রহকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে নতুন বিগ্রহ স্থাপন

করে পূজা করতে হবে। ব্যবস্থা দিয়ে, বিদায় নিয়ে পণ্ডিতেরা চলে গেলেন। মথুরানাথ কারিগরকে আর একটা নতুন মূর্তি তৈরি করতে আদেশ দিলেন— যেমন ছিল অবিকল সেইরকম মূর্তি হওয়া চাই।

রাণী যখন এই সংবাদ পেলেন তখন তিনি তাঁর জামাইকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, ছোট ভট্‌চাজকে এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করেছ ?

—না তো। আর তিনি তো তেমন শাস্ত্রজ্ঞ নন যে এ বিষয়ে বিধান দেবেন ?

—শাস্ত্র না জানতে পারেন, কিন্তু তিনি যে পবিত্রতা ও সারল্যের জীবন্ত বিগ্রহ—এটা মানো তো। যাও, তাঁর কাছে গিয়ে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করগে। তিনি কি বলেন শোনো। তিনি যা বলবেন, তাই হবে।

মথুরবাবু এলেন গদাধরের কাছে। বললেন সব কথা। শুনেই তিনি ভাবাবিষ্ট হয়ে গেলেন। ভাবমুখে তিনি বলতে লাগলেন, রাণীর জামাইদের কেউ যদি পড়ে পা ভেঙে ফেলতো, তবে কি তাকে ত্যাগ করে আর একজনকে তার জায়গায় এনে বসানো হোত—না তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হোত ? এখানেও সেইরকম করা হোক। মূর্তি ফেলে দিতে হবে কিসের জন্য ? মূর্তির পা জুড়ে দেওয়া হোক।

ব্যবস্থা শুনে সকলে অবাক।

তাই তো, কারো মাথায় এ সহজ যুক্তিটা আসেনি ?

—মা, ছোটভট্‌চাজ বললেন, বিগ্রহমূর্তি পরিবর্তনের দরকার নেই। পা জুড়ে দিলেই চলবে।

—ওঁকেই বলো, উনি জুড়ে দেবেন।

গদাধর রাণীর অনুরোধে বিগ্রহের ভাঙা পা নিজের হাতে এমনভাবে জুড়ে দিলেন যে বিগ্রহের পা যে কখনো ভেঙেছিল তা

বুঝতে পারা যেত না। পূজা আগের মতোন চলতে লাগলো। কারিগর নতুন মূর্তি গড়িয়ে নিয়ে এলে, সেটা প্রতিষ্ঠা করার আর দরকার হোল না। গদাধর রাধাকান্তের পূজক নিযুক্ত হোলেন। হৃদয় মায়ের বেশকারী হোলেন।)

দু' মাস পরের কথা।

রাধাকান্তের পূজা করেন এখন গদাধর। মন্দিরে প্রণামী পড়তো। সেসব ন্যায়তঃ পূজারীর প্রাপ্য। গদাধর কিন্তু তার এক কপর্দকও নিতেন না। গরীব কাঙালীদের মধ্যে তা বিলিয়ে দিতেন। তাঁর এই নির্লোভতা দেখে মথুরবাবুর শ্রদ্ধা আরো বেড়ে যায়। একদিন তিনি কথায় কথায় তাঁকে বলেন, বাবা, মায়ের পূজোর ভারটা তুমি দয়া করে নাও।"

—কেন? দাদা তো রয়েছেন। তা'ছাড়া আমি মন্ত্র-তন্ত্র কিছু জানি না।

—বড় ভট্চাজ মশায়ের শরীর দিন দিন অপটু হচ্ছে। তিনি এখন থেকে বিষ্ণুঘরে পূজা করবেন। এ পূজার তো বিশেষ কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। তোমার পূজায় মন্ত্র-তন্ত্রের দরকার নেই।

সত্যিই তাই। রামকুমার এখন বৃদ্ধ হয়েছেন। শরীর অপটু। কালীঘরের গুরুতর কার্যভার বহন করবার মতো শক্তি আর নেই। গদাধরও তাঁর অগ্রজের কাছে দেবীর পূজা ও সেবাকার্য কিভাবে সম্পন্ন করতে হয়, তা এতদিনে শিখে নিয়েছেন। পূজারীর পরিবর্তন হোল। গদাধর ভবতারিণীর পূজক নিযুক্ত হোলেন। রামকুমার ছুটী নিয়ে বাড়ি চলে গেলেন। তিনি আর দক্ষিণেশ্বরে ফেরেন নি। এর অল্পকাল পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। মথুরবাবু তখন হৃদয়কেই স্থায়ীভাবে বিষ্ণুঘরের পূজকপদে নিযুক্ত করলেন।

রামকুমার গদাধরের চেয়ে বয়সে একত্রিশ বছরের বড়ো ছিলেন। তাঁর শৈশবে পিতার মৃত্যু হওয়াতে অগ্রজই ছিলেন তাঁর কাছে

পিতৃতুল্য। সেই পিতৃতুল্য অগ্রজের সহসা মৃত্যু হওয়ায় গদাধর যারপর নাই ব্যথিত হোলেন।

মায়ের পূজায় গদাধর উৎসর্গ করে দিলেন নিজেকে।

পূজো করতে করতে মন তাঁর ভবতারিণীর ধ্যান ও চিন্তায় তন্ময় হয়ে যায়। সে তন্ময়তা ভাষায় বুঝিয়ে বলবার নয়, শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব করবার জিনিস। তাঁর পূজা একটা দেখবার জিনিস ছিল। যে দেখত সে-ই মুগ্ধ হোত। পূজার পর দেবীমূর্তির সামনে বসে তিনি রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের গান গাইতে গাইতে আত্মহারা হয়ে যেতেন; চোখের জলে বুক ভেসে যেত। তখনকার গদাধরকে দেখে মনে হোত—সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব যেন মানুষের দেহ ধরে মাতৃ-পূজায় বসেছেন। পূজার সময় তাঁর বাহ্যজ্ঞান থাকত না। শুধু তাই নয়। যখন অঙ্গন্যাসাদি করতেন তখন মন্ত্রবর্ণে তাঁর সমস্ত শরীরটা জ্বলন্ত হয়ে উঠতো।

"রং ইতি জলধারয়া বহ্নিপ্রাকারং বিচিন্ত্য"—এই মন্ত্র উচ্চারণ করে চারদিকে যখন জলের ছিটা দিতেন, তখন গদাধর স্পষ্ট দেখতে পেতেন তাঁর চারদিকে অগ্নি লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করে রয়েছে—যেন তাঁকে ও পূজোর জায়গাটাকে সমস্ত রকম অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা করছে। পরবর্তীকালে ঠাকুর বলতেন—"যখন ধ্যান করতে বসতাম তখন গঠ্ গঠ্ করে আমার শরীরের গ্রন্থিগুলো যেন কে চাবী দিয়ে বন্ধ করে দিত। আর আমার নড়বার ক্ষমতা থাকত না—গ্রন্থি না খোলা পর্যন্ত আসন ছেড়ে উঠবার ক্ষমতা থাকত না।"

যেমন পূজায় তন্ময়তা, তেমনি সুমধুর কণ্ঠে গান।

সে গান যে একবার শুনতো, সে আর ভুলতে পারত না। ছোট ভট্চাজের গান রাণীর খুব প্রিয় ছিল। তিনি যখনই দক্ষিণেশ্বরে আসতেন, গদাধরকে ডাকিয়ে তাঁর গান শুনতেন। "কোন্ হিসাবে

হর হৃদে দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে”– এই গানটি তাঁর খুব প্রিয় ছিল। তাঁর গানে কালোয়াতি ঢং থাকত না, ওস্তাদি কায়দা থাকত না; থাকতো শুধু গানের ভেতরকার ভাবটির প্রকাশ—মর্মস্পর্শী মধুর স্বরে প্রকাশ। আর থাকতো তাল ও লয়ের বিশুদ্ধতা। ভাবই গানের প্রাণ—এই কথাটা বেশ বোঝা যেত তাঁর গান শুনে।

পূজারীর পদে নিযুক্ত হওয়ার অল্পদিন পরেই গদাধর দীক্ষা নেবেন ঠিক করলেন। মায়ের পূজা তন্ত্রমতে করতে হয়। শক্তিদীক্ষা না নিলে তন্ত্রমতে পূজাতে অধিকার জন্মায় না। কার কাছে দীক্ষা নেওয়া যায়? তিনি শুনেছিলেন কেনারাম ভট্টাচার্যের কথা। রামকুমারের সঙ্গে এঁর আগে থেকেই আলাপ ছিল। তিনি একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক। থাকতেন কোলকাতার বৈঠকখানায়। তাঁর কাছেই দীক্ষা নেবেন ঠিক করলেন। ইনি মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে আসতেন। মথুরবাবু সব ব্যবস্থা করে দিলেন। মন্দিরেই দীক্ষার স্থান নির্দিষ্ট হোল। কেনারাম এলেন একদিন। মায়ের পূজা করে গদাধরের কানে দিলেন তিনি দীক্ষামন্ত্র। কানের ভেতর দিয়ে যেন একেবারে তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে গিয়ে পৌঁছল সেই দিব্যমন্ত্র। শোনামাত্রই ভাবাবেশে সমাধিস্থ হন তিনি। সে ভাব দেখে স্তম্ভিত হন কেনারাম। কিছুক্ষণ পরে ভাব সংবরণ হয়; গদাধর তাঁর দীক্ষাদাতাকে প্রণাম করেন।

—তোমার ইষ্টলাভ হবে, আশীর্বাদ করেন কেনারাম।

শুধু পূজো নিয়েই থাকতেন গদাধর।
বাজে কথা একটিও বলতেন না।
তিলমাত্র সময় অপব্যয় করতেন না।

দিনে ও রাতে পূজো যেই শেষ হয়ে গেল, অমনি আর তাঁর দেখা নেই। তিনি একেবারে নিখোঁজ-বেপাত্তা। কোথায় যেতেন?

নহবতের উত্তরে জঙ্গলের মধ্যে পঞ্চবটী। সেইখানে আমলকী গাছের তলায় বসে তিনি আসন করে ধ্যান করতেন নিবিষ্টচিত্তে। দিনের বেলায় সবাই যখন কাজকর্মে ব্যস্ত, তখন সকলের অলক্ষ্যে পঞ্চবটীতে এসে বসতেন গদাধর। রাতেও তাই—সন্ধ্যারতির পর যখন রাতে মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যেত, তখন তিনি লোকসঙ্গ ত্যাগ করে এই নির্জন পঞ্চবটীতে চলে আসতেন। সারা রাত কেটে যেত জগন্মাতার ধ্যানে। হৃদয় ভেবেই পেতেন না তাঁর মামা কোথায় অন্তর্হিত হন। মাঝে মাঝে শুধু তিনি দেখতে পেতেন গদাধর নহবতের উত্তরদিকের জঙ্গল থেকে বের হতেন।

এ রকম হোলে তো চলবে না, ভাবেন হৃদয়রাম। মামা রাতে ঘুমোন না, এজন্য তাঁর চিন্তার অন্ত রইল না। মন্দিরে ঠাকুরসেবার খাটুনি কম নয়, তার ওপর মামার খাওয়া-দাওয়া ইদানীং একেবারে কমে গিয়েছে। এমন অবস্থায় রাতে না ঘুমোলে শরীর ভেঙে যেতে পারে। হৃদয় ঠিক করলেন, এ বিষয়ের খোঁজ খবর নিতে হবে আর যথাসাধ্য প্রতিবিধান করতে হবে।

তখনকার পঞ্চবটী খানাখন্দ আর জঙ্গলে ভরা ছিল। নীচু জমি। বুনো গাছ-গাছড়ার মধ্যে কেমন করে একটা আমলকী গাছ জন্মেছিল। দক্ষিণেশ্বরের এই দিকটাই ছিল কবরডাঙা, তার ওপর জঙ্গল। দিনের বেলাতেই কেউ বড়ো একটা ঐখানে যেত না; গেলেও জঙ্গলের মধ্যে ঢুকবে এমন সাধ্য কার? আর রাতে তো কথাই নেই ভূতের ভয়ে কেউ ঐদিক মাড়াতো না। আমলকী গাছটা ছিল নীচু; তার নীচে যদি কেউ বসে থাকতো, জঙ্গলের বাইরে উঁচু জমি থেকে তাকে কেউ দেখতে পেতো না। গদাধর এরই তলায় বসে রাতের বেলায় নির্জনে ধ্যানধারণা করতেন।

মামা যায় কোথায়?

হৃদয়রামের কৌতূহল বেড়ে ওঠে।

একদিন রাতে অলক্ষ্যে মামার পিছু নিলেন তিনি। দেখলেন গদাধর সোজা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেলেন। তিনি বিরক্ত হবেন ভেবে হৃদয় আর এগুলেন না। মামাকে ভয় দেখাবার জন্য তিনি বাইরে থেকে কিছুক্ষণ ঢিল ছুঁড়তে লাগলেন ভেতরে। গদাধর ফিরলেন না দেখে, হৃদয় ফিরে এলেন। বেশিক্ষণ দাঁড়ানো যায় না এখানে, গা ছম্ ছম্ করে।

পরের দিন সকালবেলা।

—মামা, ঐ জঙ্গলের ভেতর রাতে গিয়ে কি করো বলো দেখি ?

—তুই জানলি কি করে ?

—কাল যে দেখতে পেলাম।

—খবরদার ওদিকে আর যাবি না, ভূতে তোর ঘাড় মটকে দেবে। কখ্খনো যেন ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করবি নে।

—তা করব না। কিন্তু তুমি কি করো ওখানে ?

—ওখানে একটা আমলকী গাছ আছে। তার তলায় বসে ধ্যান করি। শাস্ত্রে বলে, আমলকী গাছের তলায় যে যা কামনা করে ধ্যান করে, তার তা-ই সিদ্ধ হয়।

কয়েকদিন পরের কথা।

সেদিন মামার পিছু পিছু চলেছেন হৃদয়।

দেখলেন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে তাঁর মামা পরণের কাপড় আর গলার পৈতা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গাছের তলায় ধ্যানে বসলেন। একেবারে উলঙ্গ।

মামা কি তবে পাগল হয়ে গেল ? ভাবেন হৃদয়। এমন কাণ্ড তো পাগলেই করে থাকে। ধ্যান করবে করো, তা এমন ভাবে ন্যাংটা হওয়া কেন ? হৃদয় আর স্থির থাকতে পারলেন না। সহসা মামার কাছে উপস্থিত হয়ে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন—এ কী হচ্ছে ? পৈতে, কাপড় সব ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে বসেছ যে ?

কিন্তু কে শুনছে সে কথা ? যাঁকে উদ্দেশ করে বলা, তিনি তো তখন গভীর ধ্যানের মধ্যে ডুবে রয়েছেন। কয়েকবার ডাকাডাকির পর গদাধরের হুঁস হয়। হৃদয় আবার বলেন—এ সব কী হচ্ছে ?

—তুই কী জানিস ? এইভাবে পাশমুক্ত হয়ে ধ্যান করতে হয়।

উত্তর শুনে হৃদয় অবাক। কী বলবেন, ভেবে পেলেন না, তিনি ফিরে এলেন। সেই তাঁর নিবিড় ধ্যানের মধ্যে কেমন করে সকল সাধকের ধ্যানের ধারা একে একে এসে মিলেছিল, এই পঞ্চবটীর তলায় কী অলৌকিক সাধনা গদাধর করেছিলেন একাদিক্রমে বারো বছর ধরে, এইবার বলব সেই দিব্য কাহিনী।

৫

"মা, তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমায় কেন তবে দেখা দিবি না? আমি ধন, জন, ভোগসুখ কিছুই চাইনে, আমায় দেখা দে!"

আকুল ভাবে প্রার্থনা করছেন নির্জন মন্দিরের মধ্যে বসে গদাধর। পূজা শেষ হয়ে গেলে প্রতিদিন তিনি দেবীকে সিদ্ধ ভক্তদের রচিত গান শোনান। এই গান ছিল সেই অদ্ভুত পূজারীর অঙ্গবিশেষ। গান তো নয়, যেন তাঁরই হৃদয়ের গভীর ব্যাকুলতা মায়ের পাদপদ্মে এসে অঞ্জলি হয়ে ঝরে ঝরে পড়তো—উচ্ছ্বাসে আর উৎসাহে ভরে উঠতো তাঁর নির্মল চিত্ত। চোখের জলে বুক ভেসে যেত। বিশ্বাস আর ভক্তি, এই দিয়ে তিনি দেবীকে প্রসন্ন করতেন। মনের অনুরাগ ঢেলে দিয়ে বলতেন—আমায় দেখা দে, মা।

দিনের পর দিন যায়।

গদাধরের মনে বৃদ্ধি পায় ব্যাকুলতা আর অনুরাগ।

কমে এলো আহার ও নিদ্রা। প্রতিদিনের অভ্যস্ত জীবনে সর্বক্ষণের জন্য তাঁর এখন শুধু একটি চিন্তা মায়ের সাক্ষাৎ দর্শন পাওয়া চাই, নইলে কিসের পূজা, কিসের ধ্যান। একদিন। মায়ের দেখা না পেয়ে সাধকের হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা। যন্ত্রণায় ছটফট করছেন গদাধর। মন্দিরের মধ্যে আর কেউ নেই। অস্থির হয়ে ভাবলেন,

মায়ের যখন দেখা-ই পেলাম না, তখন এ জীবনের আর দরকার নেই। এই দণ্ডেই এ জীবনের অবসান করব। দেয়ালে ঝুলছিল মায়ের সুতীক্ষ্ণ খড়গ। সেদিকে দৃষ্টি পড়ে তাঁর। উন্মত্তের মতোন ছুটে গিয়ে যেই সেই খড়গখানা তিনি ধরেছেন অমনি সেই আলোকিত মুহূর্তে মায়ের অদ্ভুত দর্শন পেলেন গদাধর। জ্ঞান হারিয়ে মন্দিরের মেঝের ওপর পড়ে গেলেন তিনি।

"ঘর, দ্বার মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হইল—কোথাও যেন আর কিছুই নাই! আর দেখিতেছি, কি এক অসীম অনন্ত চেতনা জ্যোতিঃ-সমুদ্র! যেদিকে যতদূর দেখি, চারিদিক হইতে তার উজ্জ্বল উর্মিমালা তর্জন-গর্জন করিয়া গ্রাস করিবার জন্য মহাবেগে অগ্রসর হইতেছে! দেখিতে দেখিতে উহারা আমার উপর নিপতিত হইল এবং আমাকে এককালে কোথায় তলাইয়া দিল! হাঁপাইয়া হাবুডুবু খাইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম।"

তাঁর সাধকজীবনের সেই প্রথম দিব্য অনুভূতির কথা এইভাবে ব্যক্ত করেছেন গদাধর।

সে গদাধর আর নেই এখন।

দিব্যদর্শন তাঁর শরীর ও মনকে ভেঙে নতুন করে গড়লো। এক নতুন রাজ্যে তিনি এখন প্রবেশলাভ করলেন। এ রাজ্যের সঙ্গে পার্থিব জগতের কোনো মিল নেই। এখানে চন্দ্রসূর্য নেই, গ্রহ নক্ষত্র নেই — আছে শুধু মায়ের অনন্ত রূপ-লহরী আর অপরূপ রূপের ছটা। সে রূপের ছটায় এদেশ উদ্ভাসিত। এখন থেকে গদাধরের কাছে এই রাজ্যই সত্য বলে মনে হোল। ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে আসে বাইরের পৃথিবী।

বিধিমত পূজা আর তাঁকে দিয়ে চলে না।

কে পূজা করবে? আসনে বসেন বটে, কিন্তু পূজোর নিয়ম বা ক্রম কিছুই আর গদাধরের মনে থাকে না, পূজো করবার আগেই

হয়তো ভোগ নিবেদন করে দিলেন। পাষাণময়ী এখন চৈতন্যময়ীরূপে সর্বদা তাঁর সামনে বিরাজ করছেন। দেখতেন—চৈতন্যরূপিনী মা যে রূপের ছটায় সমস্ত ঘর আলোকিত করে বসে আছেন। কখনো তিনি তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন, কখনো বা দেখতেন, তিনি নৈবেদ্য নিবেদন করবার আগেই তা গ্রহণ করবার জন্য মা সিংহাসন থেকে নেমে আসছেন।

সত্যি সে গদাধর আর নেই।

দিব্যদর্শনের তরঙ্গে পড়ে তাঁর বৈধীভক্তির বাঁধ ভেঙে চূর্ণ হয়ে গেল। আয়ত চোখ দুটি এখন সবসময়ের জন্য টকটকে লাল—মদ খেলে মাতালের চোখ যেমন লাল হয়, ঠিক তেমনি। আর সে চোখ সর্বক্ষণের জন্য জলে ভরে থাকতো। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। লোকের মনে ধারণা হোল তিনি পাগল হয়ে গিয়েছেন। হৃদয়ের দুশ্চিন্তার অবধি নেই। যদি বাবুদের কানে এ কথা যায় তা'হোলে তো চাকরি খতম। কিন্তু ক'দিন আর চেপে রাখা যায়? কথাটা জানাজানি হয়ে গেল।

রাণী রাসমণি ও মথুরবাবুর কানে গেল গদাধরের এই দিব্য-উন্মাদ-ভাবের কথা। পূজারী নাকি পাগল হয়ে গিয়েছেন—ফুলবেলপাতা প্রভৃতি নিজের পায়ে ঠেকিয়ে মায়ের পাদপদ্মে অর্পণ করেন। সৃষ্টিছাড়া এমন ধরণের পূজার কথা কেউ কখনো শোনেনি। কখনো বা পূজার আসন ছেড়ে সিংহাসনের ওপর উঠে সস্নেহে জগদম্বার চিবুক ধরে আদর করছেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন। পাথরের মূর্তির সঙ্গে কথা বলা!—এ তো এক পাগল ছাড়া আর কেউ করে না। কখনো বা জগদম্বাকে অন্নাদি ভোগ নিবেদন করতে করতে তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়াতেন; থালা থেকে এক গ্রাস ভাত-তরকারি নিয়ে, "খা, মা খা! বেশ করে খা!"—আকুলভাবে বলতেন এই কথা। কখনো বা নিজে খেয়ে সেই উচ্ছিষ্ট দিতেন মায়ের মুখে। একদিন

রাতে ঠাকুর শয়ান দিতে গিয়ে মায়ের রূপোর খাটেই কিছুক্ষণ শুয়ে রইলেন গদাধর।

এসব অনাসৃষ্টি কাণ্ড কি আর চাপা থাকে?

মন্দিরের কর্মচারীদের মধ্যে রটে গেল—ছোট ভট্চাজ পাগল হয়ে গেছে। যা রটে, তা কিছু বটে। খাজাঞ্চীরা একদিন এসে সেজবাবুর কাছে কথাটা তুললো। তাঁর বিশ্বাস হোল না।

—আজ্ঞে, বাবু আমরা যে স্বচক্ষে দেখেছি।

—আচ্ছা, তোমরা যাও।

—নিশ্চয়ই কোনো উপদেবতার ভর হয়েছে ওঁকে। মায়ের ভোগরাগাদি কিছুই আর নিয়ম মতো হচ্ছে না এখন।

মথুরবাবু শুনলেন সব কথা। মনটা বিষণ্ণ হোল।

জানবাজার থেকে তিনি নিজেই একদিন এলেন দক্ষিণেশ্বরে। কাউকে খবর না দিয়েই তিনি এসেছিলেন সেদিন। এসেছিলেন ঠিক পূজোর সময়ে। গদাধর তখন পূজোয় বসেছেন। অলক্ষ্যে থেকে তিনি পূজারীর কার্যকলাপ দেখতে লাগলেন। দিব্যভাবে বিভোর পূজারী—মাকে নিয়েই তিনি তন্ময়। মন্দিরে কে আসছে, কে যাচ্ছে, সেদিকে তাঁর হুঁস নেই। ভাবে বিভোর সেই মূর্তি দেখে মথুরানাথ চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলেন। ছোট ভট্চাজের পূজায় তন্ময়তা আর তাঁর ভক্তি-বিগলিত ভাব দেখে মোহিত হোলেন তিনি। একটা অপূর্ব আনন্দে ভরে উঠলো তাঁর হৃদয়। অনুভব করলেন তিনি—দেবতার প্রকাশে মন্দির যেন সত্যিই জমজম করছে।

এতদিনে সার্থক হোল, দেবী-মূর্তি-প্রতিষ্ঠা ভাবেন মথুরবাবু। এ পূজারী সত্যই মায়ের কৃপা লাভ করেছেন। কর্মচারীদের কাউকে কিছু না বলে মথুরবাবু সেদিন ফিরে এলেন জানবাজারে। পরের দিন তাঁর হুকুম-নামা এলো—ভট্টাচার্য মহাশয় যে ভাবেই পূজো করুন না যেন তাঁকে কেউ বাধা দেবে না।

পূজারীর ঐরকম অদ্ভুত পূজা দেখে জানবাজারে ফিরে গিয়ে মথুরানাথ রাণীমাকে সব কথা বললেন।

—মা, আপনি একবার স্বচক্ষে না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না যে মন্দিরে এখন সত্যি-সত্যিই দেবীর দিব্য আবির্ভাব হয়েছে।

(রাণীর শরীর রোমাঞ্চিত হয়, এই কথা শুনে। তা হোলে আমার মন্দির-প্রতিষ্ঠা এতদিনে সার্থক হোল—মনে মনে ভাবেন তিনি আর স্মরণ করেন মন্দির-প্রতিষ্ঠার আগের দিন রাত্রে সেই বিচিত্র স্বপ্নের কথা। স্বপ্ন সত্যি হোল এতদিনে। রাসমণি নিজেই এলেন একদিন গদাধরের পূজা দেখতে। কালীমন্দিরে বসে মায়ের পূজো দেখছেন তিনি। পূজো শেষ হয়ে গেলে, গদাধর রাণীর কথামতো গান গাইলেন। ভাবাবিষ্ট গদাধর বুঝতে পারলেন, ঠাকুর ঘরে বসেও রাণী তখন বিষয়কর্মের চিন্তা করছেন। এটা তাঁর কাছে ভালো লাগল না। সেই অবস্থায়ই তিনি এক মৃদু চাপড় মারেন রাণীর গালে আর বলেন—এখানেও ঐ চিন্তা!)

রাণীর শিক্ষা হোল।

এমন শিক্ষা তিনি জীবনে আর কখনো পান নি।

পূজারী তবে অন্তর্যামী!—নইলে কেমন করে তিনি জানতে পারলেন তাঁর মনের চিন্তা। সেই থেকে গদাধরের ওপর তাঁর বিশ্বাস ও ভক্তি আরো বেড়ে গেলো। কিন্তু সেইসঙ্গে পূজকের নতুন ব্যবস্থাও হোল। ছোট ভট্চাজ এখন দিব্য উন্মাদ—এ অবস্থায় মায়ের বিধিমত পূজার জন্য একজন শাস্ত্রজ্ঞ নতুন পূজারী দরকার। নিযুক্ত হোলেন রামতারক চট্টোপাধ্যায়; গদাধরেরই খুড়তুতো ভাই। ঠাকুর এঁকেই হলধারী বলে ডাকতেন। দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের সাধনজীবনের আদিপর্বে হৃদয় আর হলধারী—এই দুজনেই ছিলেন তাঁর সেবক। হলধারী অবশ্য বয়সে বড়ো ছিলেন। পূজারীর পদে ব্রতী

হ'য়েই হলধারী মথুরানাথকে জানালেন, তিনি সিধে নিয়ে স্বপাকে আহার করবেন।

—কেন, আপনার ভাই ও ভাগ্নে তো ঠাকুরবাড়িতে দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করেন, বললেন মথুরানাথ।

—আমার ভাইয়ের কথা আলাদা। সে এখন উচ্চাবস্থা লাভ করেছে।

—বেশ। আপনার নিষ্ঠাভঙ্গ হয় এমন অনুরোধ করব না।

দেখতে দেখতে চার বছর কেটে গেল।

এইসময়ের মধ্যে গদাধর নিজের হাতে স্থাপন করেছেন একটা নতুন পঞ্চবটী। সেইখানে পেতেছেন তাঁর তপস্যার আসন। অশ্বত্থ, বট, অশোক, বেল আর আমলকী—এই পাঁচটী পবিত্র গাছ দিয়ে তৈরি হয় পঞ্চবটী। এই পঞ্চবটীতে ধ্যান সর্বশ্রেষ্ঠ ধ্যান—তন্ত্র-পুরাণে এই কথা আছে। কালীবাড়ির জনসাধারণ এখন গদাধরকে পাগল বলে জানে। কিন্তু রাণী, মথুরবাবু আর দু'চারজন অন্তরঙ্গ লোকে জানত যে, তিনি পাগল নন—ঈশ্বরদর্শনের জন্য তাঁর অন্তরে এখন জেগেছে তীব্র ব্যাকুলতা। জ্বালাময়ী সেই ব্যাকুলতার ফলেই তিনি উন্মাদের মতোন আচরণ করতেন। কথা বলতেন উন্মাদের মতোন।

লোকে বলতো বায়ুরোগ হয়েছে।

সরলপ্রাণ গদাধর তা-ই বিশ্বাস করতেন। মথুরবাবুকে একদিন বললেন সেই কথা।

—মথুর, আমি গরীব বামুন, বাড়িতে আমার বুড়ো মা বর্তমান। এ কি ভাব হোল আমার? সবাই পাগল বলে ঠাট্টা করে। এর কোনো সদুপায় করতে পারো?

—নিশ্চয়ই করবো, বাবা। আজই আমি কোলকাতায় গঙ্গাপ্রসাদ কবিরাজকে খবর দিচ্ছি। তিনি এসে তোমাকে দেখে যাবেন।

মথুরের আশ্বাস পেয়ে খুশি হন গদাধর।

এলেন গঙ্গাপ্রসাদ কবিরাজ।

তখনকার দিনে কোলকাতার নাম-করা কবিরাজ ছিলেন ইনি। লোকে বলতো গঙ্গাপ্রসাদ সেন সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। নাড়ি টিপে রোগের নিদান ধরতেন, রুগীর পরমায়ু পর্যন্ত সঠিক বলে দিতে পারতেন। সেই গঙ্গাপ্রসাদ একদিন এলেন দক্ষিণেশ্বরে। জীবনে তিনি অনেক রুগী দেখেছেন, কিন্তু এমন অদ্ভূত আশ্চর্য রুগী এই প্রথম দেখলেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞান ছিল পুঁথিতে সীমাবদ্ধ আর যা কিছু অভিজ্ঞতা তা ছিল লৌকিক জগতের। অলৌকিক জগতের সংবাদ তাঁর কাছে ছিল অজানা। তাই গদাধরের রোগের লক্ষণ দেখে মধ্যমনারায়ণ তেল আর চতুর্মুখ বটিকা সেবনের ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি।

কিন্তু তাতে রোগ নিরাময় হয় না।

আর একবার গঙ্গাপ্রসাদের বাড়িতেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হোল। কই গো, কিছুই তো উপকার বুঝছি না, আপনি যে বললেন দু'দিনেই সেরে যাবে—সরল মনে বলেন গদাধর। গঙ্গাপ্রসাদের সামনে তখন বসেছিলেন আরেকজন কবিরাজ— গঙ্গাপ্রসাদেরই দূর-সম্পর্কের এক ভাই। নবাগত এই রুগীটিকে দেখেই তিনি একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর তাঁর হাবভাব দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, ইনি কি যোগ-টোগ করেন? সঙ্গে ছিলেন হৃদয়। তিনি বললেন, হ্যাঁ। "তবে তো ঠিক মিলেছে। ইনি তো দিব্যোন্মাদ", এই কথা বললেন তিনি গঙ্গাপ্রসাদকে। আরো বললেন, ওষুধপত্তরে এ রোগ আরোগ্য হওয়ার নয়। তখন গঙ্গাপ্রসাদ আবার তাঁর রুগীকে পরীক্ষা করলেন। এতদিন ধরে তিনি কবিরাজী করে আসছেন, তাঁর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা কোনো কাজেই এলো না। প্রথমটায় তিনি ধরতেই পারেন নি যে এ কোনো রোগ নয়, এ হোল ঈশ্বরে অনুরাগ।

হলধারী ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত।

নাকে নস্যি টিপে শাস্ত্রব্যাখ্যা করতেন তিনি। ভাইয়ের হাব-ভাব তাঁর কাছে দুর্বোধ্য মনে হোত—মনে হোত পাগলের পাগলামী ছাড়া আর কিছু নয়। একদিন কথায় কথায় তিনি গদাধরকে বললেন, তোমার কালী তো তামসী। এ দেবীর আরাধনা কর কেন ?

গদাধর ঐ কথা শুনে তখন তাঁকে কিছু বললেন না।

কিন্তু ইষ্ট নিন্দা শুনে মনটা বিষণ্ণ হোল।

এলেন মন্দিরে। সজলনয়নে জগন্মাতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মা, হলধারী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। সে তোকে তমোগুণময়ী বলে। তুই কি সত্যি ঐরূপ ?

—না। আমি সর্বগুণময়ী। ত্রিগুণময়ী আমি।

মন্দিরের ভেতরের চার দেয়াল কাঁপিয়ে কে যেন বললে এই কথা। রোমাঞ্চ দিলো গদাধরের সর্ব শরীরে। উল্লাসে উৎসাহিত হয়ে তিনি সোজা ছুটে এলেন হলধারীর কাছে। একেবারে চেপে বসলেন তাঁর কাঁধে।

—তুই না শাস্ত্র পড়িস ? তুই মাকে তামসী বলিস ?

—এখনো বলছি।

—মিথ্যে কথা। মা যে সব। ত্রিগুণময়ী।

আবেগে উত্তেজনায় গদাধরের কণ্ঠস্বরে যেন প্রত্যয়ের সুর ঝঙ্কৃত। হলধারীর মুখে আর কোনো কথা নেই। গদাধরের কথায় ও স্পর্শে শাস্ত্রাভিমানী পণ্ডিতের অন্তরের চক্ষু যেন ফুটে উঠলো। পূজোর আসনে বসেছিলেন তিনি। কেমন যেন একটা দিব্যচেতনায় আচ্ছন্ন হয় তাঁর সত্তা। অন্তর দিয়ে তিনি স্বীকার করলেন তাঁর ভায়ের কথা ; আর তাঁরই মধ্যে যেন প্রত্যক্ষ করলেন সাক্ষাৎ জগদম্বার আর্বিভাব। ফুলচন্দন নিয়ে অঞ্জলি দিলেন ভক্তিভরে গদাধরের

পায়ে। গদাধর চলে গেলেন। সেখানে তখন দাঁড়িয়ে ছিলেন হৃদয়রাম।

—মামা, এই তুমি বলো মামাকে ভূতে পেয়েছে, তবে তাঁকে ঐভাবে পূজো করলে যে? জিজ্ঞাসা করেন হৃদয়রাম।

হলধারী বলেন, কি জানি, হৃদু, কালীঘর থেকে ফিরে এসে সে আমাকে কি যে একরকম করে দিলো, আমি সব ভুলে তার মধ্যে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের প্রকাশ দেখতে পেলাম।

৬

শেষ পর্যন্ত কথাটা কামারপুকুরেও জানাজানি হোয়ে গেলো। একমুখ থেকে অন্যমুখে পল্লবিত হোয়ে কথাটা যখন চন্দ্রাদেবীর কানে এসে পৌঁছলো তার সারমর্মটা তখন এই দাঁড়াল—গদাই পাগল হোয়ে গিয়েছে।

—এই তো দেখে এলাম কাদা-ধূলো মেখে উলঙ্গ হোয়ে মাটিতে মুখ ঘষছে আর আপন মনে বলছে, মা, আমায় দেখা দে।

—এই তো জেনে এলাম তোমার ছেলের বায়ুরোগ হয়েছে, কোবরেজী চিকিৎসা হচ্ছে।

—আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম গদাটা একেবারে বদ্ধ উন্মাদ হোয়ে গিয়েছে। তোমার যেমন কপাল।

পাঁচজনের মুখে এইসব কথা শোনেন আর চন্দ্রাদেবীর মাতৃ-হৃদয় পুত্রের জন্য উদ্বেলিত হোয়ে ওঠে। একজন পরিচিত লোককে বললেন; হ্যাঁগা, একবার গিয়ে আমার গদাইকে এখানে নিয়ে আসতে পারো?

তাই হোল। কামারপুকুর থেকে একদিন সত্যিই লোক এলো দক্ষিণেশ্বরে গদাধরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। মথুরানাথ শুনলেন সব কথা। ভাবলেন, মন্দ নয়; বাড়িতে মায়ের কাছে কিছুদিন থাকলে সুফল ফলতে পারে। ছুটী মঞ্জুর হোল। দীর্ঘকাল বাদে গদাধর ফিরলেন তাঁর জন্মস্থান কামারপুকুরে।

দীর্ঘ চার বছর পরে ছেলেকে দেখলেন চন্দ্রাদেবী।

না, সব মিথ্যে কথা, তাঁর গদাই তো পাগল হয়নি। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে তিনি তাকিয়ে দেখলেন পুত্রের অন্তস্থল পর্যন্ত। গায়ে স্নেহের স্পর্শ বুলিয়ে অনুভব করেন তিনি তাঁর প্রিয়পুত্রের দিব্যোন্মাদ অবস্থা, মুখে কিছু বলেন না বা কাউকে কিছু জানতে দিলেন না। কিন্তু চাপা আর থাকে না।

কামারপুকুরে ফিরে কিছুদিন ভালভাবেই কাটল, কিন্তু ভিতরের আকুলতা তো আর বেশি দিন চাপা থাকে না—ঠেলে বেরিয়ে আসে গদাধরের কণ্ঠ-নিঃসৃত 'মা' 'মা' রবের সঙ্গে। সে কি ব্যাকুলভাবে কান্না। আবার কাঁদতে কাঁদতে ভাবের আবেগে তিনি হোয়ে পড়েন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। পরিজনরা আতঙ্কিত হন। চন্দ্রাদেবীই বেশি উৎকণ্ঠিত বোধ করেন। আত্মীয়েরা পরামর্শ দিল, যদি ছেলের কল্যাণ চাও তবে ওঝা ডাকাও।

ঠাকুর নিজের মুখে বলেছেন ঃ "একদিন একজন ওঝা এসে একটা মন্ত্রপূত পলতে পুড়িয়ে শুঁকিয়ে দিল ; বললো, যদি ভূত হয় তো পালিয়ে যাবে, কিন্তু কিছুই হোল না। পরে কয়েকজন প্রধান ওঝা পূজাদি করে একদিন রাত্রিকালে চণ্ড নামাল। চণ্ড পূজা ও বলি গ্রহণ করে প্রসন্ন হোয়ে তাদেরকে বললে, 'একে ভূতে পায়নি বা এর কোনো অসুখ করেনি।"

সবাই তখন বিশ্বাস করলো যে গদাই পাগল হয়নি, তবে সে সাধু হোতে চায় ভগবানকে পেতে চায়, সংসারে তার টান নেই। তখন আত্মীয়স্বজন সকলে পরামর্শ দিলেন, ছেলের বিয়ে দাও, তা'হলেই সব ঠিক হোয়ে যাবে। দেখবে বৌ'এর ওপর ভালবাসা পরলে ছেলের মন আর উরু উরু করবে না, সংসারধর্মে সে মন ঢেলে দেবে তখন, এই উপদেশ দিলেন এক বর্ষিয়সী প্রতিবেশিনী।

—রামেশ্বর গদাইয়ের জন্যে একটা মেয়ে খুঁজে বের কর দেখি। বেশ সুলক্ষণা মেয়ে দেখবি।

মায়ের আদেশ পেয়ে গদাইয়ের মধ্যমাগ্রজ কনিষ্ঠের জন্য পাত্রী খুঁজতে লেগে গেলেন। আশেপাশের কয়েকখানা গ্রামেও লোক পাঠিয়ে দেওয়া হোল। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের ছোট ছেলের বিয়ে হবে—কথাটা জানাজানি হয়ে যায় লোকের মুখে মুখে। বিয়ের কথাটা প্রথমে গদাধরের কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছিল। কিন্তু গোপন থাকলো না বেশি দিন। এইসময়ে হৃদয়রাম দক্ষিণেশ্বর থেকে কামারপুকুরে এসেছেন তাঁর প্রিয়তম মাতুলকে দেখতে। প্রথম সাক্ষাতেই গদাধর তাঁর ভাগ্নেকে বলেন, ওরে হৃহু, শুনছিস, এরা আমার বিয়ে দেওয়ার জন্যে উঠে-প'ড়ে লেগেছে, কিন্তু মেয়ে খুঁজে পাচ্ছে না। পাবে কি করে ? ঐ জয়রামবাটী গাঁয়ে রামচন্দ্র মুখুয্যের মেয়েটি যে কুটো-বেঁধে রাখা আছে, দেখ গে যা।"

হৃদয় তো মামার এ কথা শুনে একেবারে অবাক।

মামা বিয়ে করতে চায় ! অন্য কেউ এ কথা বললে তিনি বিশ্বাসই করতেন না—বিয়ে করতে তাঁর অনিচ্ছা নেই, শুধু তাই নয়—ভাবী কনেটির সন্ধান পর্যন্ত বলে দিলেন। অথচ, হৃদয় ভাবলেন, এই মানুষই দক্ষিণেশ্বরে নারী-প্রসঙ্গে কি কাণ্ডই না করেছেন। তবে কি তাঁর দেবকল্প মামার ভাবী বধূটিকে বিধাতাপুরুষ আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছেন ? হৃদয়রাম আর ভাবতে পারেন না।

গদাধরের কথাই সত্য।

লোক পাঠিয়ে খবর নিয়ে জানা গেল যে কামারপুকুর থেকে দু' ক্রোশ দূরে জয়রামবাটীর সদাচারী ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটি মেয়ে আছে বটে, কিন্তু তার তো বিয়ের বয়স হয়নি, তার বয়স এখন পাঁচ বছর মাত্র। বয়সের যে অনেক তফাৎ, একজন মন্তব্য করলেন।

—হোক বয়সে ছোট, ঐ মেয়েই আমার ছেলের বৌ, দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন চন্দ্রাদেবী।

তারপর একদিন বৈশাখের এক শুভলগ্নে রামচন্দ্র মুখুয্যের মেয়ে সারদার সঙ্গে গদাধরের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হোয়ে গেলো। গদাধরের বয়স তখন চব্বিশ বছর। বিয়ের দেড় বছর পর তিনি ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। আবার আগের মতোন ব্রতী হোলেন জগদম্বার সেবায়। কিছুদিন যেতে না যেতেই জগন্মাতার অর্চনায় এমন তন্ময় হোয়ে পড়লেন যে, মা, ভাই, স্ত্রী, সংসার—সকলের কথা-ই ভুলে গেলেন। কামারপুকুর মুছে গেল তাঁর মন থেকে। সেই মনের মধ্যে এখন বিরাজ করতে লাগলেন সর্বক্ষণের জন্য জগৎ-জননী। আবার নতুন করে শুরু হয় তাঁর সাধনা।

দক্ষিণেশ্বরে ফিরবার কিছুদিন পরে পুণ্যবতী রাণী রাসমণি দেহত্যাগ করলেন। এখন থেকে মথুরানাথ সর্বেসর্বা হয়ে উঠলেন। ছোট ভট্চাজের ওপর তাঁর ভক্তি ও বিশ্বাস আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি। এখন থেকে তিনি তাঁরই সেবায় যেন নিজেকে বিলিয়ে দিলেন। তনুমন-নিবেদিত এই সেবা চলেছিল নিরবচ্ছিন্ন ধারায় এগার বছর। এইবার গদাধরের সাধনায় শুরু হয় নতুন পর্ব।

একদিন প্রত্যূষে পঞ্চবটী-সংলগ্ন বাগানে গদাধর ফুল তুলছেন। এমনিভাবে ফুল তিনি রোজই তোলেন ; নিজের হাতে মালা তৈরি করে ভবতারিণীকে সাজাতে ভালবাসতেন তিনি। গঙ্গার ধারে দক্ষিণেশ্বরের এই ফুলের বাগানটি দেখলে যেন চোখ জুড়িয়ে যেত। কত রকমের ফুলের গাছ সেই বাগানে আর কি বিচিত্র শোভা সেই বাগানের। সর্বদাই সুগন্ধে ভরপুর। গদাধর একমনে ফুল তুলছেন, এমন সময়ে একখানা নৌকা এসে লাগল সেই বাগানের ঘাটে।

নৌকা থেকে নামলেন গৈরিকবস্ত্র-পরিহিতা, আলুলায়িত দীর্ঘ কেশা

এক ভৈরবী। অপরূপ সুন্দরী। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। প্রৌঢ়া হোলেও যৌবনের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য যেন এখনো ঘিরে রয়েছে তাঁকে। নৌকা থেকে নেমে সোজা চাঁদনীর দিকে চলতে থাকেন তিনি। ফুল তুলতে তুলতে গদাধর দেখলেন এই সন্ন্যাসিনীকে,—শুধু দেখা নয়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হোল এ ভৈরবী যেন তাঁরই নিকট আত্মীয়া। ঠাকুরঘরে ফিরে এসেই হৃদয়কে ডেকে বলেন হৃদু, চাঁদনীতে একটি ভৈরবী এসেছেন, তাঁকে ডেকে আনতে পারিস ?

—বলো কি মামা ? ডাকলেই সে আসবে কেন ?

—আমার নাম করে ডাকলেই আসবে।

—কি যে বলো মামা তার ঠিক নেই। কে কোথাকার ভৈরবী, জানা নেই, শোনা নেই, তাকে তুমি এখানে ডাকবেই বা কেন ?

—সে তুই বুঝবিনে। আমি বলছি, তুই আমার নাম করে ডেকে নিয়ে আয়।

হৃদয় আর তর্ক করে না। মামার স্বভাব সে জানে। সে চলে যায় চাঁদনীর দিকে। অল্পক্ষণ পরেই তার পিছনে পিছনে ভৈরবী প্রবেশ করলেন গদাধরের ঘরে। তাঁকে দেখামাত্র ভৈরবীর মুখে ফুটে ওঠে বিস্ময়ের রেখা। বিস্ময় আর আনন্দ।

—তুমি এখানে আছ, বাবা! আমি যে তোমাকে নানাস্থানে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি। দুই চোখ বিস্ফারিত করে স্নেহবিভাসিত স্বরে বলে উঠলেন ভৈরবী।

—আমার কথা কেমন করে জানতে পারলে মা ?

—এ কথা জগদম্বার কৃপায় আগেই জেনেছিলাম। আজ এখানে তোমার দেখা পেলাম।

দেখতে দেখতে গদাধর যেন বালক হোয়ে যান। বালকের মতোই মনের সব কথা তিনি খুলে বলেন তাঁর কাছে। একান্ত আগ্রহে বার বার জিজ্ঞাসা করতে থাকেন—হ্যাঁগা, আমার এ সকল কি হয়

—এই অলৌকিক দর্শন, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত হওয়া, গা জ্বালা করা—এসব কি গা ? জগদম্বাকে মনে-প্রাণে ডেকে সত্যিই কি আমার কঠিন ব্যাধি হোল ? লোকে যে আমাকে পাগল বলে।

সরল মনে মনের কবাট খুলে দিলেন গদাধর।

ভৈরবী নিবিষ্টচিত্তে শুনলেন এই নবীন সাধকের আত্মকাহিনী। শুনতে শুনতে তাঁর মনের মধ্যেও নানাভাবের সঞ্চার হয়। স্নেহময়ী জননীর ন্যায় বাৎসল্যে আত্মহারা হোলেন তিনি। শেষে স্নেহ-মধুর স্বরে তিনি বলেন—কে তোমাকে পাগল বলে, বাবা ? তোমার এ অবস্থা কি পাগলের ? একে বলে—মহাভাব।

—মহাভাব কি ?

—ঈশ্বরের ভাব। ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য দেহ-মনকে তুমি তোলপাড় করেছ, তাই এইসব অবস্থা। যাঁরাই ভগবানকে একমনে ডেকেছেন, তাঁদের সবারই ঐ রকম অবস্থা হয়েছে এবং হয়। ভক্তি-শাস্ত্রে এসব কথা লেখা আছে। আমার কাছে যে সব পুঁথি আছে, আমি তোমাকে দেখাব।

কথায় কথায় বেলা হয়।

—এবার উঠি বাবা ; রঘুবীরের ভোগের সময় হোল, এই বলে ভৈরবী উঠলেন। তাঁর হাতে একটি ছোট পুঁটুলি, তার মধ্যে কয়েকখানি পুরাতন পুঁথি এবং গলায় বাঁধা ছিল একটি শালগ্রাম। গদাধর শুনলেন, সেইটিই রঘুবীর শিলা। তিনি হৃদয়কে বলে ঠাকুরবাটীর ভাণ্ডার থেকে ভৈরবীর সেবার জন্য সিধা আনিয়ে দিলেন। ভৈরবী সিধা নিয়ে চলে গেলেন।

যথাসময়ে স্বহস্তে রন্ধন করে ভৈরবী রঘুবীরের উদ্দেশে ভোগ নিবেদন করতে বসলেন। সম্মুখে তাঁর শালগ্রাম শিলায় অধিষ্ঠিত ইষ্টদেব রঘুবীর, স্বহস্তে প্রস্তুত ভোগের উপচার তাঁর উদ্দেশে নিবেদিত, স্তিমিতনেত্রে ভৈরবী গভীর ধ্যানের মধ্যে তন্ময় হোয়ে

যান। লুপ্ত হয় বাহ্যজ্ঞান, আর তাঁর দুই চোখ বেয়ে ঝরে প্রেমাশ্রু-ধারা। ঠিক এই সময় কোথা থেকে টলতে টলতে গদাধর সেইখানে এসে উপস্থিত—একেবারে ভোগের সামনে বসে পড়লেন। ভৈরবী কিছুই জানতে পারেন না। যখন তাঁর ধ্যান ভাঙলো, তখন সবিস্ময়ে তিনি চেয়ে দেখেন যে বাহ্যজ্ঞান বিরহিত গদাধর রঘুবীরকে নিবেদিত অন্ন নির্বিকার চিত্তে গ্রহণ করছেন।

পাষাণ শিলা বুঝি এতদিনে জাগ্রত হোল।

রোমাঞ্চিত কলেবরে ভৈরবী সেই দৃশ্য অপলক নয়নে দেখেন আর ভাবেন—এই তো আমার রঘুবীর। ততক্ষণে ভাবাবিষ্ট গদাধর প্রকৃতিস্থ হয়েছেন। নিজের আচরণ দেখে ক্ষুব্ধভাবে বলেন—কে জানে বাপু, আত্মহারা হোয়ে কেন এইরকম সব কাজ করে বসি।

—বেশ করেছ বাবা, এরকম কাজ তো তুমি করনি, তোমার ভেতরে যিনি আছেন, তিনিই করিয়েছেন। ধ্যানে আমি যা দেখেছি, তাতেই বুঝতে পেরেছি—কে এ-রকম করেছে, আর কেনই বা করেছে। আর এ-কথাও আজ বুঝতে পেরেছি বাবা, বাহ্যপূজাও আমার শেষ হয়েছে, আর তার দরকার নেই। এতদিনে পূজা আমার সার্থক হোল। রঘুবীর শিলাকে এবার গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেব।

মন্দিরের ঘাটের কাছেই এক নির্জন স্থানে তাঁর আসন প্রতিষ্ঠিত করলেন ভৈববী।

এ তাঁর নিজের সাধনার জন্য নয়—গদাধরের জন্য। এরপর থেকেই ভৈরবীর উপদেশে শাস্ত্রবিহিত সাধনায় ব্রতী হোলেন তিনি আর তাকে সহায়তা করতে লাগলেন সাক্ষাৎ তন্ত্রমূর্তি ভৈরবী নিজে। এই কাজের জন্যেই তো তাঁর দক্ষিণেশ্বরে আসা।

—আমি তোমাকে একে একে সমস্ত তন্ত্র শেখাব। আমি জগদম্বার আদেশ পেয়েছি।

আর তো সংশয় রইল না গদাধরের। তিনি এইবার গুরুরূপে বরণ করলেন মঙ্গলরূপিণী অমৃতময়ী ভৈরবীকে। তাঁর প্রতি অপত্য-প্রেমে মুগ্ধহৃদয়া সন্ন্যাসিনী দক্ষিণেশ্বরেই রয়ে গেলেন। এই সরল প্রকৃতি ও মাতৃনামে আত্মহারা সাধকের মুখের কথা শুনে ভৈরবীর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হোল—ইনি কখনই সামান্ত সাধক নন। ধারণা হোল—এই দেবদেহে একসঙ্গে এসেছেন শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ। ইনি অবতার। যুগাবতার।

কথাটা দক্ষিণেশ্বরে লোকের মুখে মুখে রাষ্ট্র হোয়ে গেল। একদিন পঞ্চবটীতে বসে আছেন গদাধর। কাছে বসে মথুর ও হৃদয়। ভগবানের প্রসঙ্গ হচ্ছিল, এমন সময় গদাধর মথুরকে বললেন, ছাখো, একজন বামুনের মেয়ে এখানে এসেছে, সে আমাকে অবতার বলে।

—তা কি করে হয়? অবতার তো দশটি। উত্তর দিলেন মথুর।

—কিন্তু সে বলে আমি অবতার। তার কাছে অনেক পুঁথি আছে আর সে সব শাস্ত্র জানে। ভৈরবী বলে, শাস্ত্রে আছে, তোমার যে যে লক্ষণ সেসব অবতার ভিন্ন মানুষে কখন হোতে পারে না।'

এইরকম কথাবার্তা হচ্ছে এমন সময় ভৈরবী স্বয়ং সেখানে উপস্থিত। একখানি থালায় নানা রকমের মিষ্টান্ন।

—ইনিই কি সেই ব্রাহ্মণী? জিজ্ঞাসা করেন মথুর।

—হ্যাঁ, ইনিই সেই। ইনিই আমাকে অবতার বলেন।

ভৈরবী আর নীরব থাকতে পারলেন না। বললেন—এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব।

—এ-কথা কোন্ শাস্ত্রে আছে? মথুরের কঠিন জিজ্ঞাসা।

ব্রাহ্মণীর ভক্তি-শাস্ত্র সব কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি সেই সব গ্রন্থ থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে তাঁর বক্তব্যের প্রমাণ দেন। মথুরানাথ শুনে স্তব্ধ হোয়ে রইলেন। তাঁর কিন্তু সংশয় দূর হয় না। ছোটভট্চাজ যে একেবারে সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার তা মানতে তাঁর বাধছিল।

যাকে তিনি অল্পবেতনে নিজের মন্দিরে পূজারীর কর্মে নিযুক্ত করেছেন তাকে তিনি 'ভক্ত' বা 'সাধক' এর বেশী কিছু স্বীকার করতে পারেন না। অন্তর্যামী ঠাকুর মথুরের মনের ভাব টের পেলেন। ভৈরবীর কথায় তাঁরো নিজের মনে একটু সংশয় জেগেছিল।

—মথুর, পণ্ডিতদের একটা সভা ডাকো, ব্রাহ্মণীর কথা যাচাই করে নেওয়া হোক, বললেন গদাধর।

মথুর তাতে রাজী হোলেন।

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ করে পত্রিকা প্রেরণ করলেন।

নির্দিষ্ট দিনে সভা আহূত হোল।

পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ ও খ্যাতনামা অন্যান্য বহু পণ্ডিত দক্ষিণেশ্বরে এসে সভার শোভা বর্ধন করলেন। সেই সভাতে একপাশে বসে আছেন ভৈরবী ও অন্য একপাশে বসে আছেন নির্বিকারচিত্তে গদাধর। বিচার আরম্ভ হোল। ভৈরবী প্রথমে ভক্তিশাস্ত্র থেকে অনর্গল ভাবে প্রমাণের পর প্রমাণ তুলে দেখাতে লাগলেন যে, গদাধরের যে দিব্যোন্মাদ অবস্থা হয়েছে, তাকে মহাভাব বলে। শ্রীরাধিকা আর মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভিন্ন আর কারো শরীরে এই মহাভাব দেখা যায়নি।

পণ্ডিতরা তাঁর মত খণ্ডন করতে পারেন না। বৈষ্ণবচরণ মুক্তকণ্ঠে ভৈরবীকে সমর্থন জানিয়ে বললেন:

প্রসঙ্গ বিচারে দেখি নাহি প্রয়োজন ॥
শ্রীঅঙ্গে শাস্ত্রের লিপি দেখিবারে পাই।
ব্রাহ্মণী বলেন যাহা আমি বলি তাই ॥

৭

এইবার বলি গদাধরের তন্ত্রমতে অলৌকিক সাধনের কথা।

চৌষট্টিখানা তন্ত্রে যেসব সাধনের কথা বলা আছে, ভৈরবী ব্রাহ্মণী একে একে তার সমস্ত শিক্ষা দিলেন গদাধরকে। শুধু শিক্ষা দেওয়া নয়—একেবারে হাতে-কলমে শিখিয়েছিলেন তিনি। তন্ত্রের সাধনা বড়ো কঠোর। বিল্ববৃক্ষমূলে তিনটি মানুষের মাথার ও পঞ্চবটীমূলে পঞ্চমুণ্ডী আসন প্রস্তুত করলেন ভৈরবী। এসব তিনি নিজেই সংগ্রহ করে এনেছিলেন। গদাধর কখনো বিল্ববৃক্ষমূলে, কখনো পঞ্চবটীতে গভীর নিশীথে কঠিন তান্ত্রিক সাধনা করতে লাগলেন।

এই বীরাচারী সাধনে পঞ্চ 'ম'-কারের প্রয়োজন হয়ে থাকে। এই বিশ্ববরেণ্য সাধকের কিন্তু মদ্য বা কারণবারি গ্রহণের প্রয়োজন হোত না। কারণের নাম শুনেই তাঁর মনে জগৎকারণের উদ্দীপন হয়ে সমাধির অবস্থা এসে উপস্থিত হোত এবং 'যোনি' নামে জগৎযোনির দর্শন এসে উপস্থিত হোত। ঠাকুর স্বয়ং এই কথা নিজমুখে বলেছেন। তিনি দেখতেন, সেই জগৎযোনি থেকে পলকে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই পঞ্চ 'ম'-কারের সাধনে প্রধান দুটি অঙ্গের ব্যবহার করার প্রয়োজনই তাঁর হোল না। রামকৃষ্ণের সাধনায় বীরাচারী সাধন পঞ্চ 'ম'-কার হীন সাধনে পরিণত হয়। সাধন জগতে এ এক নতুন ব্যাপার।

তন্ত্রসাধনার পথে তিনি যতই অগ্রসর হোতে থাকেন। ততই যেন তাঁর আগের স্বভাবের আমূল পরিবর্তন হোতে থাকে। শুধু স্বভাবের নয়, দেহেরও। শরীরে রূপ যেন আর ধরে না ; অপূর্ব তেজঃপুঞ্জময় হোয়ে উঠলো তার সর্বদেহ—সর্বাঙ্গে সৌন্দর্য যেন উথলে পড়ছে। যে ছাখে, সে-ই আবিষ্টের মতোন চেয়ে থাকে।

ঠাকুর নিজেই বলেছেন ঃ "তখন এমন রূপ হয়েছিল যে, লোকে চেয়ে থাকতো ; বুক, মুখ সব সময় লাল হয়ে থাকতো ; আর গা দিয়ে যেন একটা জ্যোতি বেরুতো। লোকে চেয়ে থাকতো বলে একখানা মোটা চাদর সর্বক্ষণ মুড়ি দিয়ে থাকতুম, আর মাকে বলতুম —মা, তোর এই বাইরের রূপ তুই নে, আমাকে ভিতরের রূপ দে। গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে চাপড়ে বলতুম—ভিতরে ঢুকে যা, ভিতরে ঢুকে যা। তবে না কতদিন পরে উপরটা এইরকম মলিন হয়ে গেল।"

এইভাবে যোগেশ্বরী ভৈরবীর সাহায্যে চৌষট্টিখানা তন্ত্রের প্রত্যেকটির সাধনে গদাধর সিদ্ধিলাভ করলেন। এইবার শিষ্যের পূর্ণ অভিষেকের অনুষ্ঠান হবে। অভিষেকের সময় সাধক শিষ্যের নতুন নামকরণ শাস্ত্রীয় বিধি। ভৈরবী বলেছিলেন, এবার নিত্যানন্দের খোলে কৃষ্ণচৈতন্যের আর্বিভাব হয়েছে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি গদাধরের নতুন নাম রাখলেন—'রামকৃষ্ণ'। এরপর বেদান্তসাধক তোতাপুরী তাঁকে 'পরমহংস' বলে অভিনন্দিত করেন। এখন থেকে আমরাও গদাধরকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলে অভিহিত করব।

কঠোর তন্ত্র-সাধনায় সিদ্ধিলাভ রামকৃষ্ণের অলৌকিক সাধক-জীবনের শেষ কথা নয়। "যত মত তত পথ"—এই সত্যের যিনি সন্ধান দেবেন তাঁকে সাধনার সকল পথ তন্ন তন্ন করে দেখতে হয়েছিল। এবং এক আধ বছর নয়, পুরো বারো বছর ধরে চলেছিল

তাঁর সাধনা এবং তাঁর দক্ষিণেশ্বরের সাধনপীঠে তিনি একে একে আকর্ষণ করে এনেছিলেন সাধনপথের সকল অভিজ্ঞ পথিককে।

তন্ত্রসাধনার পর রামকৃষ্ণ করলেন কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের সাধনা। অপূর্ব এই সাধনা। একদিন কয়েকটি টাকা ও খানিকটা মাটী নিয়ে 'টাকা মাটী—মাটী টাকা' বলতে বলতে মাটীর সঙ্গে টাকাগুলি গঙ্গার জলে বিসর্জন দিলেন। অর্থ তুচ্ছ হয়ে গেল মৃত্তিকাখণ্ডের মতো। সেই থেকে তিনি জীবনে আর টাকা ছুঁতে পারতেন না। তেমনি রমণী মাত্রেই তাঁর কাছে মাতৃবৎ মনে হোল—'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু'—এই অপূর্ব সাধনায় তিনি ব্রতী হোলেন। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার পর থেকে রামকৃষ্ণ স্ত্রীজাতির কাউকেও—এমন কি নিজের বিবাহিতা পত্নীকেও—ভোগলালসার চক্ষে কখনো দেখতে পারতেন না। রমণীতে হোল এখন জননী জ্ঞান।

এইবার সর্বজীবে শিবজ্ঞান লাভ করার পথে অগ্রসর হন তিনি। শুরু হয় দীনতা ও নিরহঙ্কার প্রকাশের আশ্চর্য সাধনা। আদর্শ সাধনাও বটে। যেখানে লোকে পদার্পণ করতে সংকোচ বোধ করে, অথবা হঠাৎ গিয়ে পড়লে স্নান না করে নিজেদের শুচি জ্ঞান করে না, রামকৃষ্ণ সেই অস্পৃশ্য অপবিত্র স্থান নিজের হাতে মার্জনা করলেন, আচণ্ডালের উচ্ছিষ্ট পাত মাথায় তুলে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে জন্মগত জাতি-অভিমানের মূলে কুঠারঘাত করলেন। দূর হয়ে যায় সব ভেদবুদ্ধি। হৃষ্টচিত্তে কাঙালীদের উচ্ছিষ্ট-ভোজনে বাধে না তাঁর—মহাপ্রসাদ জ্ঞানে তা মাথায় তুলে নিয়ে আনন্দে নৃত্য করেন তিনি।

এই সময়কার কাণ্ডকারখানা দেখে হৃদয় একদিন না বলে থাকতে পারল না, আচ্ছা মামা, তুমি না জগদম্বার পূজারী—তবে এইসব অনাচার করছ কেন ?

—অনাচার কি রে শালা ? আচার-অনাচার বলে কিছু নেই ; ওসব মিথ্যা।

—ঐ যে সেদিন মেথরের খাওয়া এঁটোপাতাখানা মাথায় তুলে নিলে—এটা কি অনাচার নয়? ওরা তো অস্পৃশ্য।

—সমাজে অস্পৃশ্য বলে কেউ নেই রে—সবই সেই সচ্চিদানন্দের অংশ।

এই ছিল তাঁর সর্বজীবে শিবজ্ঞানের বিচিত্র সাধনা।

তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভের পর আরম্ভ হয় প্রকৃতি সাধনা। বৈষ্ণব-শাস্ত্রে আছে শান্ত, দাস্য, সখ্য প্রভৃতি ভাবসাধনের কথা। সে শুধু কথার কথা কি না তা এবার জানতে চাইলেন রামকৃষ্ণ। সখ্যভাবের সাধনা আর দাস্যভাবের সাধনা তিনি আগেই করেছিলেন ; এইবার তিনি নিজেকে মায়ের সখীরূপে কল্পনা করলেন। চামর হাতে মায়ের মন্দিরে সেইভাবে ব্যজন করেন ; কখনো কখনো স্ত্রীলোকের বেশ পরিধান করে দেবীসেবা করতেন ; তাঁর অন্তরে তখন প্রকৃতি-ভাব এমন ফুটে উঠেছিল যে, তিনি যে পুরুষ, এ-কথা ভুলে যেতেন।

রামকৃষ্ণের এই বিচিত্র সাধনকালেই একদা দক্ষিণেশ্বরে এলেন বিগ্রহ-সাধক জটাধারী। ইনি ছিলেন একজন রামাইত সাধু। শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন তাঁর ইষ্টদেবতা। রামচন্দ্রের বালমূর্তিই ছিল তাঁর উপাস্য। পরবর্তীকালে এই জটাধারীর কথা ঠাকুর নিজের মুখে এইভাবে ব্যক্ত করেছেন : "আহা, জটাধারীর কি ভক্তি, বিশ্বাস! কি সেবার নিষ্ঠা! সে রামলালার চিরকাল সেবা করতো। যেখানে যেত সঙ্গে করে নিয়ে যেত। যা ভিক্ষে পেত রেঁধে-বেড়ে তাকে ভোগ দিত। শুধু তাই নয়—সে দেখতে পেত রামলালা সত্যিসত্যিই খাচ্চে বা কোন একটা জিনিষ খেতে চাইছে, বেড়াতে যেতে চাইছে, আবদার করছে। জটাধারীর কাছ থেকেই তো রামলালা আমার কাছে থেকে গেল।"

শ্রীরামচন্দ্রের এক ধাতুময় বাল-বিগ্রহ আর তার উপাসক জটাধারী —রামকৃষ্ণের সাধকজীবনে একটি বিচিত্র অধ্যায়। এই বিগ্রহের

সেবা আর তার সম্বন্ধে সাধুর আচরণ—দুই-ই যারপর নাই বিস্ময়কর! জটাধারীর কাছে এই বিগ্রহটি, বিগ্রহ মাত্র ছিল না—ছিল তাঁর স্নেহাধীন সন্তান। সন্তান-জ্ঞানেই তিনি তার পূজা করতেন, ভালবাসতেন, আদর-যত্ন করতেন, নিজের হাতে খাইয়ে দিতেন আবার কখনো বা বালকের দুরন্তপণা দেখে তিরস্কার করতেন। এই ধাতুময় বিগ্রহ নিয়েই তিনি যেন সর্বক্ষণ উন্মত্ত।

জটাধারীর ভাব দেখে হৃদয় তো অবাক্।

একে তো মাতুলের নিত্য নতুন ভাব তাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে, তার ওপর এই অদ্ভুত ভাবের তরঙ্গ তুলে এ আবার কোন্ পাগল এলো? পাগলই তো, নইলে ধাতুময় বিগ্রহকে কেউ বলেঃ "খাও বাপ, খাও, রাগ ক'রো না, আজ এই খাও, কাল ক্ষীরের লাড্ডু এনে দেব!" অথবা—"ওরে, ওরে, কাঁটাবনে কোথায় ছুটে চলেছিস, গা ছ'ড়ে যাবে যে এখুনি", অথবা—"তোর জন্যে যে জ্বালাতন হলাম, আমার জপতপ, ধ্যান-ধারণা সব গোল্লায় গেল! সর্বস্ব ত্যাগ করে তোকে নিয়ে বেরিয়েছি, ভিক্ষে করে এনে তোকে খাওয়াচ্ছি, তবুও তোর মন পাই না রে!"

সাধুর মুখে এই ধরণের সব কথা শুনে হৃদয় মনে মনে হাসেন আর ভাবেন—সাধুর এসব ছেলেখেলা ছাড়া আর কি!

—মামা, পাগলের সঙ্গে তুমিও কি পাগল হোলে না কি? একদিন রামকৃষ্ণকে এই কথা বললেন হৃদয়।

—তুই কি বুঝবি রে জটাধারীর এইসব কার্যকলাপ।

—বিগ্রহকে জীবন্ত মনে করে, এ পাগল ছাড়া আর কি?

—আমি তা মনে করি নে, হৃদু। জটাধারী গোপাল-মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেছে নিশ্চয়ই। আমি তোকে ঠিক বলছি হৃদু, ঐ ধাতুময় বিগ্রহের মধ্যে স্বয়ং ঈশ্বর মূর্তি পরিগ্রহ করে ঐভাবে সাধুর সেবা গ্রহণ ছলে বাল- সুলভ লীলা করছেন।

হৃদয় আর তর্ক করে না। রঘুবীর তাঁদের কুলদেবতা; তাই রামকৃষ্ণ আগে থেকেই রাম-মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন সত্য, কিন্তু সেই শ্রীরামচন্দ্রের বালকরূপ দর্শনের জন্য কোনো দিনই তো তিনি আকৃষ্ট হন নি। এইবার তাঁর মনে প্রবল আগ্রহ জাগল—ঈশ্বরকে বালকরূপে দেখতে হবে। বলা বাহুল্য, এ আগ্রহ জটাধারীর প্রভাবেই হয়েছিল। রামকৃষ্ণ এক অপূর্ব আকর্ষণে জটাধারীর বাল-বিগ্রহের পাশে বসে থাকেন কেমন করে কোথা দিয়ে সময় চলে যায়, বুঝতে পারেন না। ঐ উজ্জ্বল ধাতু-বিগ্রহটি তাঁকে যেন বাৎসল্যভাবে অভিভূত করে সর্বক্ষণ নিজের কাছেই ধরে রাখতে চায়।

এরপরই একদিন রামকৃষ্ণ সাধুকে বললেন—আমাকে দীক্ষা দাও।

দক্ষিণেশ্বরে এসে অবধি জটাধারী এই দিনটির জন্যই যেন প্রতীক্ষায় ছিল। তিনি পরমানন্দে শুভদিনে গোপাল-মন্ত্রে ঠাকুরকে দীক্ষা দিলেন। ভক্তিমান সাধক এখন থেকে এই মন্ত্র সহায় করে সাধু-প্রদর্শিত পথে বাৎসল্য-ভাবের সাধনা করতে লাগলেন। যখনই যে ভাবের সাধনায় তিনি প্রবৃত্ত হতেন, তখন তন্ময় হয়েই তিনি তাতে ডুবে যেতেন। তাই দেখা গেল অল্পদিনের একাগ্র সাধনার ফলে তিনি গোপাল-মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করলেন।

কিন্তু তার চেয়েও একটা অদ্ভুতকাণ্ড দেখা গেল।

প্রবীণ ও নবীন দুই ভক্তকে নিয়ে সেই ধাতুময় বিগ্রহ রামলালা বাৎসল্য রসের এক অপূর্ব লীলা দেখালেন—সে লীলারঙ্গ দক্ষিণেশ্বরে আর কেউ দেখতে পেল না সেদিন। দীক্ষার পর রামকৃষ্ণের মনে হোল—রামলালা যেন আর জটাধারীর কাছে থাকতে চায় না। সে এখন সর্বক্ষণ তাঁর বুকের মধ্যে থাকতে সমুৎসক। ক্রমে জটাধারী বুঝলেন তাঁর আজীবনের পুজিত বিগ্রহ এখন তাঁকে ছেড়ে

রামকৃষ্ণের কাছে থাকতে ব্যগ্র। ছল ছল চক্ষে তিনি দেখেন, রামলালা ছুটে চলেছে রামকৃষ্ণের পিছনে পিছনে। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে তিনি বলেন—আমাকে ছেড়ে ও এখন তোমাকে চায়।

উভয় সংকটে পড়লেন জটাধারী।

একদিন বিগ্রহটি হাতে নিয়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন রামকৃষ্ণের সম্মুখে ; হাতের বিগ্রহটি শিষ্যের হাতে সমর্পণ করে জটাধারী বলেন, —"এই নাও আমার সর্বস্ব ধন।"

—সে কি ? আপনি কি নিয়ে থাকবেন ? বিস্মিত স্বরে বলেন রামকৃষ্ণ।

—তার আর দরকার নেই। আমাকে বাঞ্ছিত মূর্তিতে দেখা দিয়েছেন রামলালা—এখন তিনি এখানেই তোমার কাছে থাকতে চান। এই নাও—এইবার আমার বিদায়ের পালা।

জটাধারীর চোখ দুটি ছল ছল করছে।

—তোমার রামলালা তুমি নাও, আমি চললাম।

এই বলে সাধু জটাধারী বিদায় নিলেন।

তন্ত্রমতে সাধনা হোল।

বাৎসল্যভাবেরও সাধনা হোল।

ভৈরবী রামকৃষ্ণকে অবতার বলে ঘোষণা করে গেলেন।

এইবার এলেন বেদান্ত-সাধক শ্রীমৎ তোতাপুরী। জটাজুটধারী দীর্ঘাকৃতি তেজপুঞ্জকলেবর এক উলঙ্গ সন্ন্যাসী। তখন এই বিশ্ববরেণ্য সাধকের অন্তরে অদ্বৈতভাব সাধনের ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেছে আর এই সাধনার পথ দেখাবার জন্যই যেন দক্ষিণেশ্বরের সিদ্ধপীঠে পরিব্রাজকাচার্য ব্রহ্মজ্ঞ তোতাপুরীর আকস্মিক আবির্ভাব হোল। রামকৃষ্ণকে দেখা মাত্রই তোতা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হোলেন।

তারপর সামান্য আলাপেই তাঁর মনে হোল, ভাবাবিষ্ট এই অসাধারণ সাধক বেদান্তসাধনের উত্তম অধিকারী।

—তুমি বেদান্তসাধনা করবে ?

—কি করব, না করব, আমি কিছুই জানি না।

—তবে কে জানে ?

—আমার মা সব জানেন, তিনি যদি বলেন, করব।

—তবে যাও, তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করে এসো।

রামকৃষ্ণ এলেন জগদম্বার মন্দিরে।

ভাবাবিষ্ট হোয়ে তিনি শুনলেন মায়ের আদেশ—তোমার জন্যই সন্ন্যাসী এখানে এসেছেন ; অসংকোচে শিক্ষা কর।

পরক্ষণেই টলতে টলতে তোতার কাছে ফিরে এলেন তিনি ; বললেন—মা আদেশ দিয়েছেন।

রামকৃষ্ণ যখন অদ্বৈতভাব সাধনে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁর বৃদ্ধা মাতা দক্ষিণেশ্বরে কালীবাটীতে অবস্থান করছেন। বড় ছেলে রামকুমারের মৃত্যু হোলে, শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধা অপর দুটি পুত্রের মুখ চেয়ে কোনো-রকমে বেঁচে ছিলেন। সংসারে কিন্তু আর তাঁর মন ছিল না তখন একদিন তিনি সংসারে বীতরাগ হয়ে চলে এলেন দক্ষিণেশ্বরে তাঁর প্রিয় পুত্র গদাধরের কাছে। বাকী জীবনটা গঙ্গাতীরে যাপন করবেন—এই ছিল বৃদ্ধার মনের ইচ্ছা। তখন থেকে দেহান্তকাল পর্যন্ত চন্দ্রাদেবী একাদিক্রমে বারো বছর এইখানেই বাস করেন ; তিনি আর কামারপুকুরে ফিরে যান নি। বধূ সারদাদেবী তখন পিত্রালয়ে বাস করছিলেন।

চন্দ্রাদেবী গদাধরের জননী।

তাঁর উদার হৃদয়ের পরিচায়ক একটি ঘটনা এখানে বলি।

ঠাকুরের প্রতি মথুরের ভালবাসা ও ভক্তির শেষ ছিল না। তাঁর বড় সাধ যে, ঠাকুরের নামে একখানা তালুক লিখে দেন, কিন্তু

সোজাসুজি কথাটা তাঁর কাছে উত্থাপন করতে মথুরের সাহস হোল না। তিনি একদিন হৃদয়ের সঙ্গে এই বিষয়ে পরামর্শ করলেন। তারপর কথাটা রামকৃষ্ণের কর্ণগোচর হতেই তিনি তো একেবারে রেগে লাল। "শালা, তুই আমাকে বিষয়ী করতে চাস"—এই বলে মথুরকে তিনি মারতে উদ্যত হলেন।

এখানে সুবিধা হবে না বুঝে, তিনি এলেন চন্দ্রাদেবীর কাছে। ঠাকুরের মা, সেই সুবাদে মথুর তাঁকে ঠাকুরমা বলে ডাকেন। চন্দ্রাদেবী থাকতেন নহবতের ঘরে। মথুর একদিন সেইখানে এসে বললেন, ঠাকুরমা, তুমি তো আমার কাছে কখনো কিছু চাইলে না; তুমি যদি আমাকে সত্যি আপনার বলে মনে কর, তা'হোলে আমার কাছ থেকে তোমার যা ইচ্ছা চেয়ে নাও।

—বাবা, তোমার কল্যাণে আমার তো এখন কোনো জিনিসের অভাব নেই ; যখন কোনো জিনিসের দরকার বুঝব তখন চেয়ে নেব।

—তবু যা ইচ্ছা কিছু চাও এখন।

—যদি নেহাত দেবে, তবে আমার এখন মুখে দেওয়ার গুলের অভাব, এক আনার দোক্তা তামাক কিনে দাও।

ঐ কথা শুনে বিষয়ী মথুরের চক্ষে জল এলো।

তখন তিনি চন্দ্রাদেবীকে প্রণাম করে বললেন, এমন মা না হোলে কি অমন ত্যাগশীল পুত্র হয়। সত্যিই তুমি রত্নগর্ভা।

এইবার বলি পরমহংস পরিব্রাজক তোতাপুরীর কথা।

পরম ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তিনি। নির্বিকল্প সমাধি ছিল তাঁর করতলগত। নর্মদাতীরে বহুকাল নির্জনে বাস করে সাধনভজনে নিমগ্ন থেকে ইনি ব্রহ্মের দর্শন লাভ করেন। তারপর নানা তীর্থস্থান ঘুরে একদিন তিনি এসে উপস্থিত হোলেন দক্ষিণেশ্বরে। আত্মারাম পুরুষ তিনি—কোথাও তিনদিনের বেশি অবস্থান করেন না। কালীবাড়িতেও

তিনি মাত্র তিনদিন থাকবেন ঠিক করেছিলেন। তোতাপুরী ঘাটের প্রকাণ্ড চাঁদনীতে এসে উপস্থিত হোলেন। রামকৃষ্ণ তখন একাসনে একপাশে বসেছিলেন। তাঁর তপোদীপ্ত ভাবোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে তোতার মনে হোল—ইনি সামান্য পুরুষ নন।

তোতা ছিলেন বেদান্তী ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। সাকার পূজায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তাই রামকৃষ্ণ শ্রীমন্দির থেকে টলতে টলতে এসে তোতাপুরীকে যখন বললেন– বেদান্তসাধনে, মায়ের আদেশ আছে তখন আমরা সহজেই কল্পনা করতে পারি যে রামকৃষ্ণের ঐ সরলভাবে মুগ্ধ হোলেও তোতার মনে এই ধারণা হোল যে, এরকম আচরণ শুধু অজ্ঞতা আর কুসংস্কারের জন্যেই। পাষাণী মূর্তি আবার কথা বলে! —তোতার অধরপ্রান্তে দেখা দেয় করুণা ও ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি।

পঞ্চবটীতলে ধুনী জ্বললো।

তোতাপুরী আসন স্থাপিত করলেন।

তারপর এইখানে এক শুভদিনে গুরুর নির্দেশ অনুসারে নবীন শিষ্য গ্রহণ করলেন, বিরজা সন্ন্যাস—প্রেত-পিণ্ড অর্পণ করলেন নিজের হাতে। হোমের পবিত্র আভায় রাঙিয়ে উঠল পঞ্চবটী ; সর্বস্ব ত্যাগের ব্রহ্মমন্ত্রে মুখরিত হয় পঞ্চবটী উপবন। আজ অদ্বৈতভাবে প্রতিষ্ঠিত হোতে চলেছেন মাতৃসাধক। গুরু উপদেশ দিলেন, এইবার মনকে নির্বিকল্প করে আত্মধ্যানে নিমগ্ন হও।

কিন্তু নামরূপের গণ্ডী ছাড়িয়ে যেতে পারেন না রামকৃষ্ণ। ধ্যান করতে বসে চেষ্টা করেন মনকে নির্বিকল্প করতে, পারলেন না। যতই ইচ্ছা করেন ততই যেন তাঁর মানসপটে ভেসে ওঠে জগদম্বার উজ্জ্বল মূর্তি। তখন তিনি চোখ মেলে তোতাকে বললেন, হোল না, মনকে সম্পূর্ণ নির্বিকল্প করে আত্মধ্যানে মগ্ন হোতে পারলাম না।)

—কেঁও হোগা নেহি? বিষম উত্তেজিত হয়ে তীব্র তিরস্কার

করে বলে উঠলেন তোতা, হবে না, এতবড়ো কথা! এই বলে কুটীরের মধ্যে এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটুকরো ভাঙা কাচ দেখতে পেলেন তিনি; তুলে নিলেন সেটা হাতে। যে দিকটা ছুঁচের মতো তীক্ষ্ণ সেই দিকটা রামকৃষ্ণের ভ্রূমধ্যে সজোরে বিদ্ধ করে বললেন, এই বিন্দুতে মনকে গুটিয়ে আনো।

"তখন পুনরায় দৃঢ় সংকল্প করিয়া ধ্যানে বসিলাম এবং জগদম্বার শ্রীমূর্তি পূর্বের ন্যায় মনে উদিত হইবামাত্র জ্ঞানকে অসি কল্পনা করিয়া উহা দ্বারা ঐ মূর্তিকে মনে মনে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলাম। তখন আর মনে কোনরূপ বিকল্প রহিল না; একেবারে হু হু করিয়া উহা সমগ্র নাম-রূপরাজ্যের উপরে উঠিয়া গেল এবং সমাধি-নিমগ্ন হইলাম।"

উত্তরকালে তাঁর সাধনজীবনের অভিজ্ঞতার কথা ভক্তদের কাছে ঠাকুর বর্ণনা করতেন এইভাবে।

রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হোলেন।

তোতাপুরী অনেকক্ষণ তাঁর কাছে বসে থাকলেন।

পরে নিঃশব্দে বেড়িয়ে এলেন—দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন। আর নিজে বসে রইলেন পঞ্চবটীতলে আসন পেতে। দরজা খুলে দেওয়ার জন্য শিষ্যের আহ্বানের প্রতীক্ষায় রইলেন তিনি।

সারাদিন গেল।

রাত এলো।

শিষ্যের কোনো সাড়া শব্দ নেই।

তোতা সর্বক্ষণ উন্মুখ।

দীক্ষার পর দ্বিতীয় দিন এলো, এদিনও কেটে গেল। তোতা চমৎকৃত। এ কি অদ্ভুত সমাধি এই নবীন শিষ্যের! পর পর তিন দিন অতীত হোল; কুটীর মধ্য থেকে শিষ্যের কোনো আহ্বানই নেই। এইবার গুরুর ধৈর্যভঙ্গ হোল। নিজেই আসন থেকে উঠে, ধীরে ধীরে

দরজা খুলে কুটীরমধ্যে প্রবেশ করলেন তিনি। দেখলেন—যেমন ভাবে বসিয়ে দিয়েছিলেন, ঠিক সেইভাবেই রামকৃষ্ণ সমাধিমগ্ন রয়েছেন। দেহে প্রাণের প্রকাশমাত্র নেই। কিন্তু মুখমণ্ডল প্রশান্ত, গম্ভীর, দিব্য-জ্যোতিঃপূর্ণ।

যা দেখছি, একি সত্য ?

তিনদিনে নির্বিকল্প সমাধি-লাভ ?

স্তম্ভিত হৃদয়ে ভাবেন তোতা। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের কঠোর সাধনায় তিনি যা উপলব্ধি করেছেন, এই নবীন বাঙালী সাধক তা কি একদিনেই আয়ত্ত করলেন! একদিনে নির্বিকল্প সমাধি-লাভ! এ কি কেউ কখনো শুনেছে? কঠোর সন্ন্যাসী তোতা, কোথাও তিন রাত্রির বেশি অবস্থান করেন না। কিন্তু শিষ্যের অদ্ভুত প্রভাবে আকৃষ্ট হোয়ে তিনি এখানে রয়ে গেলেন প্রায় এক বছর।

৮

এরপর থেকে রামকৃষ্ণ দিনরাত তোতার সঙ্গে বেদান্তের আলোচনা করতেন। আর সর্বক্ষণ অদ্বৈতভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন। তোতা রোজই নিয়মমত ধ্যানে বসতেন। একদিন রামকৃষ্ণ প্রশ্ন করলেন, তুমি তো ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, তবে নিত্য ধ্যানের কি প্রয়োজন ?

—নিত্য ধ্যানে মন শুদ্ধ থাকে, ময়লা ধরে না। যেমন এই পিতলের লোটা, রোজ না মাজলেই ময়লা ধরে।

—কিন্তু লোটা যদি সোনার হয়। হেসে বললেন রামকৃষ্ণ।

তোতার মুখে আর কথা নেই। ভাবলেন, সত্যিই তো! বাইরে শুধু বললেন—তা বটে।

একদিন।

ঠাকুর হাততালি দিয়ে হরিনাম করছেন।

তোতার কানে গেল। অমনি তিনি আসন থেকে উঠে এসে ধমকে বললেন—আরে, কেঁও রোটি ঠোক্‌তে হো ?

—কানা নাকি! দেখতে পাচ্ছ না—ঈশ্বরের নাম করছি ?

—ঈশ্বরের নাম করছ তো হাতে তালি দিচ্ছ কেন ?

—যে দেওয়াচ্ছে, সেই জানে; ওসব ভাবের ব্যাপার। তুমি বুঝবে না

—কি, আমি বুঝব না! তুমি এতবড়ো কথা বলো ?”

—বলি কি সাধে! তুমি ব্রহ্ম নিয়েই মেতে আছ;

—আলবৎ থাকব, ব্রহ্মই তো সব।

—মানলুম, কিন্তু তার সঙ্গিনী যে মায়া,—সেই যে তার ভাব-রূপিনী শক্তি; সে খবর তো তুমি রাখ না।

—আমি অভীঃ। আমার ঐ ধুনীর আগুনের মতোই আমি ভাবহীন, মায়াহীন ও কঠিন; আমি নিষ্কলঙ্ক, নির্বিকার।

সম্মুখেই তোতার ধুনী জ্বলছিল।

তোতা শেষের কথাগুলো খুব জোর দিয়ে বললেন। রামকৃষ্ণ তখন আছেন ভাবমুখে। গভীর প্রত্যয়ের ভঙ্গিতে তিনি তাঁর গুরুকে বললেন—তুমি শুধু বিচার করে, তর্ক করে ঈশ্বরের সন্ধান করেছ,—এই পর্যন্ত তোমার দৌড়। কিন্তু সেই ঈশ্বরকে যে ভালবাসা যায়, তার জন্যে কাঁদতে পারা যায়, নাচতে পারা যায়, তাঁর কথা কীর্তন করে বলা যায়, এসব যে তোমার ধারণার বাইরে।

—নেহি—নেহি। আমি ধুনীর আগুনের মতোই ভাবহীন মায়াহীন, নিষ্কলঙ্ক ও নির্বিকার।

এমন সময়ে যেন অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়া এক কাণ্ড করে বসলেন। ধুনী জ্বলছে। হঠাৎ তোতা তাকিয়ে দেখেন, দেবালয়ের এক ভৃত্য ধুনী থেকে একখানা জ্বলন্ত কাঠ টেনে নিচ্ছে। অমনি ধুনীর আগুনের মতোই জ্বলে উঠলেন তিনি। কী, এতবড় স্পর্ধা! যে পবিত্র ধুনীর আগুনে আমি আহুতি দিই, সেই আগুন নিয়ে তামাক খাওয়া।

পাশেই ছিল চিমটা। সেটা তুলে নিয়ে তোতা তাকে আক্রমণ করলেন। রামকৃষ্ণ সবিস্ময়ে দেখলেন তাঁর বৈদান্তিক গুরুর ক্রোধের বহর। তিনি আর থাকতে পারলেন না; বললেন, দূর শালা! এই না বলছিলি—সব ব্রহ্ম, সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ!

তোতার মুখে কথা নেই।)

হাতের চিমটে ফেলে তিনি স্তব্ধভাবে আবার আসনে বসে পড়লেন। একটা শিক্ষা হোল শিষ্যের কাছে। আরো কিছুদিন কাটলো। ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানীর মনে এই ধারণা জাগল—ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি, অভেদ। একদিন গভীর নিশীথে জগজ্জননীর অচিন্ত্য ও বিরাট্ রূপের প্রোজ্জ্বল প্রকাশ দর্শন করে কৃতার্থ হোলেন তিনি। অমন মানুষটি যেন একেবারে বদলিয়ে গেলেন। যে মুখে হাসির লেশমাত্র ছিল না, এখন তা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তোতা স্বীকার করলেন, আমার আধ্যাত্মিক সাধনাই অপূর্ণ ছিল, তোমার সাহায্যেই তা এতদিনে পূর্ণ হোল। এইবার আমাকে বিদায় দাও।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বর থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। যাওয়ার আগে তিনি সকলকে বলে দিলেন, যেন রামকৃষ্ণকে তারা 'পরমহংস' বলে ডাকে।

এইভাবে যিনি ছিলেন গদাধর চট্টোপাধ্যায়, তিনিই এখন থেকে হোলেন—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

একদিন মথুরবাবু এলেন।

মুখটি তাঁর বিষণ্ণ।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে তোমার, মথুর ?

—বাবা, আর বুঝি তোমার সেবা করতে পারলাম না, এই বলে তিনি হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

ঠাকুর একটু বিচলিত না হোয়ে পারলেন না। মথুর তাঁর পরম ভক্ত। কাছে বসিয়ে, তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে তিনি আবার বলেন—আমাকে খুলে বলো মথুর, কি হয়েছে, তোমার। তাঁর প্রত্যেকটি উচ্চারিত কথায় আশ্বাস আর স্নিগ্ধ সহানুভূতির আভা। তখন মথুর বললেন যে, তাঁর স্ত্রী জগদম্বা দাসীর প্রাণ-সংশয় পীড়া।

জগদম্বা না বাঁচলে আমি যে তোমার সেবাধিকার থেকে বঞ্চিত হব, বাবা। বিষণ্ণচিত্তে বলেন মথুর।

মথুরের দৈন্য দেখে ঠাকুর আর স্থির থাকতে পারেন না ; তাঁর হৃদয় করুণায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। বিশ্বাসী মথুর ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতা বলে জানতেন ও মানতেন। খানিকক্ষণ পরে ভাবাবিষ্ট হয়ে রামকৃষ্ণ মথুরকে বললেন, ভয় নাই, তোমার পত্নী আরোগ্য লাভ করবে।

ঠাকুরের অভয়বাণীতে প্রাণ পেয়ে মথুরবাবু জানবাজারে ফিরে এলেন। ফিরে এসে দেখলেন, জগদম্বা দাসীর অবস্থার খুব পরিবর্তন হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, সেদিন থেকে জগদম্বা দাসী ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করতে লাগল আর তার ঐ রোগটার ভোগ আমার শরীরের ওপর দিয়ে যেতে লাগল। মথুরের বৌ-কে ভাল করেই তো ছ'মাস পেটের অসুখে ভুগেছিলাম।

তন্ত্রসাধন হোল।

মধুরভাবের সাধন হোল।

বেদান্তসাধন হোল।

এইবার ইসলাম ধর্মসাধনের দিকে মন গেল রামকৃষ্ণের।

সেইসময়ে গোবিন্দ রায় নামে একজন ক্ষত্রিয় বংশের লোক দমদমায় বাস করতেন। তিনি সুফী সাধকগণের জীবনী আলোচনা করে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে সুফী মতে সাধন করেন। কথিত আছে, তিনি নির্জনে বহুকাল সাধন করে সুফী ধর্মের সর্বোচ্চ তত্ত্ব জানতে পেরেছিলেন। গোবিন্দ একদিন ভ্রমণ করতে করতে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে উপস্থিত হোলেন। পঞ্চবটীতে তখন সকল সম্প্রদায়ের সাধু, ফকিরকে সিধা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। গোবিন্দ দেখলেন ভিক্ষান্ন এখানে সহজলভ্য ;

তিনি কিছুদিন থেকে গেলেন এবং এখানে থেকেই নিজ সাধন-ভজনে রত হোলেন।

সাধক ও প্রেমিক গোবিন্দকে দেখে রামকৃষ্ণ তার প্রতি আকৃষ্ট হোলেন। পঞ্চবটীর শান্তিপ্রদ ছায়ায় আসন পেতে সাধন-ভজনে রত এই সুফী প্রেমিকের সঙ্গে আলাপ করে কালীসাধক রামকৃষ্ণ মুগ্ধ হোলেন। ক্রমে তাঁর মন ইসলাম ধর্মের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ বোধ করতে থাকে।

"এও তো ঈশ্বরলাভের এক পথ। অনন্তলীলাময়ী মা এ পথ দিয়েও তো কত লোককে তাঁর শ্রীপাদপদ্মলাভে ধন্য করেছেন। কেমন করে তিনি এই পথ দিয়ে তাঁর আশ্রিতদিগকে কৃতার্থ করেন, তা দেখতে হবে।" এইরকম ভাবনা-চিন্তার উদয় হোল রামকৃষ্ণের মনে। যে চিন্তা, সেই কাজ। একদিন তিনি গোবিন্দকে মনের ইচ্ছা প্রকাশ করে বললেন, আমাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দাও। আমি এই ভাবসাধনে নিযুক্ত হোতে চাই। তারপর শুভদিনে শুভক্ষণে পঞ্চবটীতে গোবিন্দ তাঁকে যথাবিধি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করলেন। শুরু হোল তাঁর ইসলাম মতের সাধনা।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব স্বয়ং তাঁর এইসময়কার সাধনা-প্রসঙ্গে বলেছেন: "ঐ সময় 'আল্লা'-মন্ত্র জপ করতাম; মুসলমানদের মতো কাছা খুলে কাপড় পড়তাম, নিয়ম করে পাঁচবার নমাজ পড়তাম। মন থেকে হিন্দুভাব একেবারে লোপ পেয়ে গেল; মন্দিরের ত্রিসীমানা দিয়ে হাঁটতাম না, কোনো হিন্দু দেব-দেবীও দর্শন করতাম না, প্রণাম করা তো দূরের কথা। এইভাবে তিনদিনের মধ্যেই ঐ মতের সাধনফল সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। এমন কি এইসময়ে একদিন এক দীর্ঘ, শ্মশ্রুবিশিষ্ট, জ্যোর্তিময় পুরুষপ্রবরের দিব্য দর্শন লাভ করেছিলাম। ইনিই ইসলামের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ।"

হৃদয় একদিন তাঁকে এই সকল আচরণের জন্য তিরস্কার করতে করতে বললেন, মামা, তুমি নিষ্ঠাবান বামুনের ছেলে হয়ে একি আচরণ করছ ?

—কি করছি ?

—কি না করছ ? কাছা খুলে দিয়েছ, দিনরাত আল্লা আল্লা করছ। এসব দেখলে লোকে কি বলবে ?

—দেখ্ হৃদু, কে যেন জোর করে আমাকে এসব করায়।

এইখানেই যুগপ্রবর্তক মহাসাধকের যুগব্যাপী সাধনার শেষ। সকলমতের সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণ যখন সর্বসিদ্ধিলাভ করলেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র বত্রিশ বছর। যত মত তত পথ—এই মহাসত্য আবিষ্কার করলেন তিনি। আবিষ্কার করলেন—সকল ধর্মের মূলে রয়েছে ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিশ্বাস ও ভক্তি। উপলব্ধি করলেন—ঈশ্বর প্রত্যক্ষ সত্য। তাঁর প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা থাকলে, তাঁকে দেখার জন্য প্রাণ-মন ব্যাকুল হোলে তিনি দেখা দেন।

বিয়ের পর একে একে আট বছর কেটে গেছে।

আট বছর পরে রামকৃষ্ণ এলেন কামারপুকুরে। সঙ্গে এলেন ভৈরবী যোগেশ্বরী আর ভাগ্নে হৃদয়। যাওয়ার আগে মথুরবাবু ও তাঁর পত্নী জগদম্বা সব জিনিসপত্র গুছিয়ে দিলেন, পাছে সেখানে গিয়ে বাবার কোনো অসুবিধা না হয়। দেবী পূজার ভার রইল অক্ষয়ের ওপর ; অক্ষয় তাঁর অগ্রজ রামকুমারের একমাত্র পুত্র এবং রামকৃষ্ণের খুব স্নেহের পাত্র। অনেককাল পরে গদাধরকে তাঁদের মধ্যে পেয়ে ঠাকুরের ছেলেবেলার বন্ধুগণ ও কামারপুকুরের অধিবাসীরা আনন্দে অভিভূত হোলেন।

কামারপুকুরে আবার আনন্দের হাট বসলো।

বধূ সারদাদেবীকে বাপের বাড়ি থেকে এখানে আনা হোল।

বিয়ের পর প্রকৃতপক্ষে এই তাঁর প্রথম স্বামি-সন্দর্শন। সেদিনের ছয় বছরের বালিকা আজ চৌদ্দ বছরের কিশোরী। সারদাদেবী এলেন উদাসীন স্বামীর সেবা করতে। বিবাহিতা পত্নীর প্রতি স্বামীর একটি কর্তব্য আছে রামকৃষ্ণ এইবার সেই কর্তব্যপালনে যত্নবান হোলেন। তাঁকে শিক্ষা-দীক্ষাদি দিয়ে তাঁর কল্যাণ-সাধনে তৎপর হোলেন। রামকৃষ্ণের স্বভাব এমনই ছিল যে, যা তিনি কর্তব্য বলে বিবেচনা করতেন, তা উপেক্ষা করতেন না, কিংবা আধখানা করে ফেলে রাখতেন না।

সাধক স্বামীর দিব্য সঙ্গে সারদাদেবীর বধূজীবনের প্রায় সাতটি মাস অতিবাহিত হয়। ঠাকুর তাঁর বালিকা পত্নীকে ঐহিক ও পারত্রিক সকল বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে ক্ষান্ত হোলেন না; দেবতা, গুরু ও অতিথির সেবা এবং গৃহকর্মে যাতে তিনি পারদর্শিনী হন, টাকা-পয়সার সদ্ব্যবহার করতে পারেন এবং সকলের ওপর ঈশ্বরে সর্বস্ব সমর্পণ করে দেশ-কাল-পাত্র ভেদে সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করতে পারেন—এসব বিষয়ে তিনি যথাযথ শিক্ষা দিলেন। তাঁর নিজের জীবন ছিল আদর্শ জীবন—অখণ্ড ব্রহ্মচর্যের মহিমায় উদ্ভাসিত সেই জীবনের উত্তাপ সারদাদেবী যেন তাঁর সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে আজ অনুভব করলেন।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী নিজেই এই প্রসঙ্গে বলেছেন: "সেই বয়সে তাঁর সঙ্গলাভ করে, তাঁর শ্রীমুখের বাণী শুনে মনে হোত যে, আনন্দের পূর্ণঘট যেন হৃদয়ের মধ্যে স্থাপিত হয়েছে—সবসময়ই মনে-মনে এমন একটা ধীর-স্থির দিব্য উল্লাস অনুভব করতাম যে তা কথায় প্রকাশ করে বোঝাতে পারা যায় না।"

আদর্শ স্বামী রামকৃষ্ণ।

আদর্শ সহধর্মিনী সারদাদেবী।

এমন দম্পতির পরিচয় পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল—এমন কি

শাস্ত্রেও এর দৃষ্টান্ত নেই। নিজের পত্নীকে তিনি জগজ্জননীর আসনে বসিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, নারীমাত্রেই ছিলেন তাঁর চক্ষে সাক্ষাৎ জগন্মাতার ছবি। পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেই আমরা প্রথম দেখলাম যে বিবাহিতা পত্নীকে ভোগের জিনিস না করে পূজার নির্মাল্যের মতন জ্ঞান করলেন। স্বামীর সাধন-পথের কাঁটা তিনি ছিলেন না—ছিলেন কমল। তাইতো আমরা দেখতে পাই যে বছরের পর বছর কত দিন ও কত রাত সারদাদেবী স্বামীর সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন—এতটুকু আসক্তি এই পরমাপ্রকৃতি সারদাদেবীকে স্পর্শ করতে পারেনি। এমনই অদ্ভুত আর অলৌকিক ছিল ঠাকুরের বিবাহিত জীবন।

নিজ-পত্নীর অধ্যাত্মজীবন গঠনে রামকৃষ্ণ যেমন সহায়তা করেছিলেন, তেমনি দেখা যায় যে, ঘর-সংসার কেমন করে গুছিয়ে করতে হয়, সে বিষয়েও তাঁকে তিনি যথাযথ শিক্ষা দিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমা নিজেই বলেছেন ঃ "প্রদীপের ওপর সলতেটি কেমন করে রাখতে হবে, বাড়ির প্রত্যেকে কে কেমন লোক ও কার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করতে হবে, অন্যের বাড়িতে গিয়ে কিরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য প্রভৃতি সংসারের সকল কথা থেকে ভজন, কীর্তন, ধ্যান, সমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞানের কথা পর্যন্ত সকল বিষয় ঠাকুর আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।"

সারদাদেবীর কথা পরে আরো বলব, এখন বলি রামকৃষ্ণের কথা।

৯

একদিন মথুরবাবুর স্ত্রী জগদম্বা স্বামীকে বললেন, চলো আমরা তীর্থ করে আসি।"

—তীর্থে গিয়ে কি হবে ?

—ঠাকুর-দেবতা দেখব ; মন্দিরে মন্দিরে পূজা দেব, আমার অনেক দিনের সাধ।

—যদি ঠাকুর-দেবতা দেখতে চাও তো বাবাকেই দেখলে হোল। আমার তো ওসব ভাল লাগে না। যাঁকে দেখলে সর্ব তীর্থদর্শনের পুণ্য হয়, যাঁর কটাক্ষে ভক্তি-মুক্তি মেলে স্বয়ং তিনিই যে আমার ঘরে। তাঁকে ফেলে কোথায় যাব ?

—তুমি তা হোলে যাবে না ?

—তোমার যেতে ইচ্ছা হয় নিজে যাও। আমি যাব না।

—তা কেন ? বাবাকে ফেলে যাবে কেন ? তাঁকেও নিয়ে চলো।

—বাবা যান তো যাবো।

রামকৃষ্ণ তখন মাত্র তিন চার দিন হয় কামারপুকুর থেকে দক্ষিণেশ্বরে ফিরেছেন। জগদম্বা তাঁর কাছে এসে প্রণাম করে বললেন, বাবা আপনি যেতে রাজী হোন ; আপনি না গেলে হবে না, বাবা।

—কোথায় যাবে ?

—তীর্থে।

পরমহংসদেব তাঁর ব্যাকুলতা দেখে তীর্থে যেতে রাজী হোলেন। মথুরানাথ অমনি আনন্দে অস্মেহারা হয়ে উৎসাহের সঙ্গে যাত্রার সমস্ত ব্যবস্থা করতে লেগে গেলেন। হঠাৎ রামকৃষ্ণের মনে হোল, মায়ের তো অনুমতি নেওয়া হয়নি। এলেন তিনি নহবতের ঘরে। বললেন তাঁকে মথুরের ইচ্ছার কথা। চন্দ্রাদেবী তীর্থভ্রমণে অনুমতি দিলেন পুত্রকে। তারপর ফাল্গুন মাসের একদিনে তাঁরা সকলে শুভযাত্রা করে তীর্থ দর্শনে বেরুলেন। দাস, দাসী, পাচক, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সঙ্গে চললো প্রায় শতাধিক লোক। দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানি ও তৃতীয়শ্রেণীর তিনখানি গাড়ি রেল কোম্পানির কাছ থেকে রিজার্ভ করে লওয়া হয়েছিল। চুক্তি ছিল যে কলকাতা থেকে কাশী পর্যন্ত পথে যে কোনো স্থানে ঐ চারখানি গাড়ি ইচ্ছামত কাটিয়ে নিয়ে মথুরবাবু কয়েকদিন অবস্থান করতে পারবেন। ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয়কেও সঙ্গে নিলেন।

তীর্থযাত্রীদল প্রথমে এলেন দেওঘর।

এখানে দ্রষ্টব্য বৈদ্যনাথ।

বৈদ্যনাথধামে চার পাঁচদিন তাঁরা অবস্থান করলেন। এখানে নিকটবর্তী গ্রামের দরিদ্রলোকদের কষ্ট দেখে পরমহংসদেব অত্যন্ত ব্যথিত হোলেন। তিনি দেখলেন, গৃহহীন লোকেরা খোলা মাঠে গাছের তলায় বাস করে, শীতগ্রীষ্ম বর্ষায় কষ্ট ভোগ করছে। দেখলেন তারা সকলেই যেন

অন্ন বিনা জীর্ণ-শীর্ণ রুগ্ন কলেবর।
অনায়াসে গোণা যায় বুকের পাঁজর॥
পরিধেয় শতগ্রন্থি মলিন বসন।
এত খাটো তাও নহে লজ্জা নিবারণ।

তাদের এই দুরবস্থা দেখে ব্যথায় কাতর হয়ে ঠাকুর কেঁদে ফেললেন এবং মথুরকে ডেকে বললেন ঃ

কখন না দেখি শুনি কাঙ্গালী এমন।
যথাসাধ্য কর অন্ন-বস্ত্র বিতরণ।

ঠাকুরের কথা মথুরের কাছে বেদবাক্যের মতোন। তাঁর সামান্য একটি ইচ্ছা পূর্ণ করতে তিনি কখনো কুণ্ঠিত হোতেন না। কিন্তু এখন যে তিনি তীর্থযাত্রায় বেড়িয়েছেন, পথে কত অর্থব্যয় হবে। তাই তিনি বললেন ঃ

"দয়াল স্বভাব তুমি দয়ার সাগর।
পর দুঃখে দ্রবে তব করুণ অন্তর॥
এত দরিদ্রের দুঃখ করিতে মোচন।
কোথায় পাইব বাবা রাশি রাশি ধন॥

মথুরের এই কথায় রামকৃষ্ণ ক্ষুণ্ণ হোলেন; বললেন, আমি আর কাশী যাব না, মথুর; এখানেই এদের মধ্যে থাকব। তাঁর যে কথা, সেই কাজ। অমনি গিয়ে বসলেন সেইসব কাঙ্গালীদের মধ্যে। ঠাকুরের এই ভাববিপর্যয় দেখে মথুর শঙ্কিত হোলেন।

—বাবা, অপরাধ হয়েছে আমার। আমি এখনি এদের সেবার আয়োজন করছি।

—মায়ের তবিলদার তুমি; খুব যত্ন করে কাঙ্গালীভোজন করাও। এদের প্রত্যেককে নগদ টাকা দাও, নতুন কাপড় দাও, মথুর।

মথুর তখনি সব বন্দোবস্ত করলেন। এক সপ্তাহকাল ধরে দরিদ্র নরনারীকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করালেন আর তাদের প্রত্যেককে টাকা ও নতুন কাপড় দান করলেন। রামকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হোলেন।

শিবধাম কাশী।

কেদারঘাটের ওপর পাশাপাশি দুখানা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন মথুর। পূজা, দান প্রভৃতি সকল বিষয়ে তিনি এখানে মুক্তহস্তে দান করতে লাগলেন। 'রাজাবাবু' বলে তাঁর খ্যাতি রটে গেল এখানে। ভাবময় ঠাকুর গঙ্গাবক্ষ থেকে নৌকায় চড়ে বারাণসী দর্শন করে কত আনন্দ পেলেন। পাল্কী চড়ে দেবদেবী দর্শনে যেতেন; মন্দিরের কাছে উপস্থিত হোলেই তাঁর ভাবসমাধি হোত। কেদারনাথের মন্দিরের কাছে দাঁড়িয়েই তিনি গভীর সমাধিতে ডুবে গেলেন। বিশ্বনাথের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি "জয় বাবা বিশ্বনাথ", বলে আনন্দে করতালি দিয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। তাঁর এই রকম ভাবাবেশ দেখে সবাই বিস্মিত হোত। তেমনি মণি-কর্ণিকার মহাশশ্মানে ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে দর্শন করে তিনি নিজেকে যেন কৃতার্থ বোধ করলেন। হৃদয়কে বলেছিলেন—"ইনিই কাশীর সচল বিশ্বনাথ।" একদিন তিনি নিজের হাতে স্বামীজিকে পায়সান্ন খাইয়ে দিলেন। তখন কাশীতে যত সাধক ও সিদ্ধ পুরুষ বাস করতেন তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে রামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ করলেন; আর্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতীও বাদ যান নি।

মণিকর্ণিকার ঘাটে শবদাহ কেমন করে হয় তা দেখবার জন্য একদিন হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে নৌকায় চড়ে গেলেন। শ্মশানঘাটে লাগবার আগেই তিনি নৌকার বাইরে এসে সমাধিস্থ হোলেন। পাছে পড়ে যান তাই হৃদয় তাঁকে ধরে রইলেন। ঠাকুর ভাবচক্ষে দেখলেন, সাক্ষাৎ রজতধবল মহাদেব সেই ঘাটে গম্ভীর মূর্তিতে দাঁড়িয়ে। নিজেই বলেছেন তিনি ঃ

সেথায় দেখিনু এক মূর্তি দীর্ঘকায়॥
পিঙ্গল-বর্ণের কণ্ঠ শোভে শিরোপরে।
অঙ্গেতে রজতকান্তি, ত্রিশূল শ্রীকরে॥

ধীর মন্দ পদক্ষেপে গম্ভীর ধারায়।
প্রত্যেক চিতার পাশে বেড়িয়া বেড়ায়॥
প্রত্যেক চিতার প্রতি দেহীটিকে তুলে।
তারকব্রহ্ম-মন্ত্র তার দেন কর্ণমূলে॥

(এবার নিত্যধাম শ্রীবৃন্দাবন।

কাশীতে প্রায় তিন সপ্তাহকাল কাটিয়ে রামকৃষ্ণ মথুরকে বললেন —মথুর, আমি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলার স্থান দেখতে যাব।

—সে কি বাবা! তুমি সেখানে যাবে কেন? সেখানে যে কেবল ন্যাড়া-ন্যেড়ীর কাণ্ড।

—আমি শুধু জানি নিত্যধাম শ্রীবৃন্দাবন রাধাকৃষ্ণের লীলাস্থান, অতি পবিত্র। আমি সেখানে যাব।

শ্রীবৃন্দাবন-দর্শনে তিনি আকুল হোয়ে কেঁদে বললেন, সবই সেই আছে—কৃষ্ণ রে। কেবল তোরেই এখানে দেখতে পাচ্ছি না। শ্রীরামকৃষ্ণের আকুল উচ্ছ্বাসে বৃন্দাবনে অনেক দিন পরে আবার যেন প্রেমের তরঙ্গ ছুটলো। যে ঘাটে বসুদেব ঘোর দুর্যোগময়ী রাত্রিতে কংস-কারাগারে সদ্যোজাত কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে গোকুলে গিয়েছিলেন, সেই ঘাটে উপস্থিত হওয়া মাত্র তিনি বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। ভাবচক্ষে তিনি দেখতে পেলেন যেন উদ্বিগ্ন বসুদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কোলে করে উর্ধ্বশ্বাসে যমুনা পার হচ্ছেন।

—মথুর, আমি বনপরিক্রমা করব।

—তাতে যে অনেক কষ্ট, বাবা।

—তবে শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরিগোবর্ধন দেখব।

—তা বেশ, বাবা। তুমি আর হৃদয় দুজনে দুখানা পাল্কীতে যাও। আমি আর যাব না।

বৃন্দাবনে তখন বাস করতেন সিদ্ধা গঙ্গামাতা। অনেক বয়স

হয়েছে তাঁর। আশীর ওপর হবে, কিন্তু মুখের কমনীয়তা যেন আট বছরের মেয়ের মতোন।) (তাঁর নাম শুনে রামকৃষ্ণ গঙ্গামাতাকে দর্শন করতে গেলেন একদিন। পরমহংসদেবকে দেখেই তিনি চমকিত হোলেন। বার বার তাঁর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। অবশেষে আনন্দের আতিশয্যে পরমহংসদেবকে সম্ভাষণ করে বলতে লাগলেন, "মেরি ব্রজদুলালী, ও মেরি লাভ্লী, আজ মেরা বড়া ভাগ্ হ্যায় যো তোমরো দর্শন মিলা।") রামকৃষ্ণদেব গঙ্গামাতার কুঞ্জে উপস্থিত হয়েই সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। গঙ্গামাতাও আনন্দে আত্মহারা হয়ে প্রাণের আবেগে বৃদ্ধ ঠাকুরের পূজা অর্চনা করতে লাগলেন। ভাবরাজ্যের সে দৃশ্য ভাষায় বর্ণনা করা চলে না।

তাঁর এই তীর্থযাত্রার কথা প্রসঙ্গে ঠাকুর একদিন মথুরকে বলেছিলেন, "দুজন লোক দেখলুম খুব উচ্চ অবস্থা। কাশীতে ত্রৈলঙ্গ স্বামী আর বৃন্দাবনে গঙ্গামাতা। গঙ্গামাতা ঠিক সখীভাবে সিদ্ধ হয়েছেন।

—বাবা, তুমি এখানেই থেকে যাও। একদিন এই কথা বললেন গঙ্গামাতা।

—বেশ তাই থাকব।

কথাটা মথুরের কানে গেল। তিনি উদ্বিগ্ন চিত্তে হৃদয়কে বলেন—ভাই, হৃদু, বাবাকে এখান থেকে নিয়ে যাবার ভার তোমার ওপর।

গঙ্গামাতার আদর-যত্নে সরল স্বভাব রামকৃষ্ণের মন থেকে দক্ষিণেশ্বরের স্মৃতি মুছে যাওয়ার উপক্রম হোল। হৃদয় তখন তাঁকে বললেন, মামা, গঙ্গামা, এখন তোমার খুব যত্ন করছেন বটে, কিন্তু তোমার যখন পেটের অসুখ করবে, তখন কে তোমায় দেখবে?

—কেন, আমি দেখব। বলেন গঙ্গামাতা।

—তা বটে, আমি ত আতপ-চালের ভাত খেতে পারব না।

—তার আর কি, না হয় সিদ্ধ চালের ভাত খাবে। বৃন্দাবনই যে তোমার স্থান, ব্রজদুলালী।

—আমি চা, মাছ, ভালবাসি।

—না, মাছ খাওয়া চলবে না। আর সব পাবে।

তখন হঠাৎ রামকৃষ্ণের মনে পড়ল নহবতে তাঁর গর্ভধারিণী মা আছেন। অমনি গঙ্গামাতার অনুরোধ ভেসে গেল।

চৈত্র মাস শেষ হয়ে এলো।

এ বছর বৈশাখ মাসে বারো বছর পরে বিশ্বনাথের শৃঙ্গার বেশ হবে, কাশী থাকতেই এ কথা শুনেছিলেন মথুর। "বাবা, বৃন্দাবনে তো একপক্ষকাল বাস হোল, এবার চলো কাশী ফিরে যাই। সেখানে বিশ্বনাথের শৃঙ্গারবেশ দেখবে না?"

—দেখব বৈ কি। চলো কাশী যাই।

প্রত্যাবর্তনের সময় কাশীতে রইলেন এক মাস। একদিন মদনপুরায় গিয়ে মহেশ সরকারের বীণা বাজানো শুনলেন। তাঁর মতোন বীণ্‌বাদক তখন আর কেউ ছিলেন না। নিবিষ্টমনে বীণার আলাপ শুনতে শুনতে সুরের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর গান গাইতে লাগলেন। সে কিন্নর কণ্ঠ শুনে বীণবাদক তো অবাক।

তীর্থভ্রমণ শেষ হোল।

মথুরের ইচ্ছা, কাশীতে কিছু দান করেন।

যাকে যেমন দান করতে হবে, রামকৃষ্ণ তা বলে দিলেন মথুরানাথকে। সেই মতো দান-ধ্যান করে কৃতার্থ হোলেন তিনি। এইবার দেশে ফেরার পালা। কাশী থেকে নানা রকমের জিনিস কেনা হোল।

—বাবা তোমার কি চাই?

—কিছুই চাই না, নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিলেন পরমহংসদেব।

—কিন্তু একটা কিছু যে চাইতেই হবে তোমাকে, নইলে আমার তীর্থদর্শন যে সার্থক হবে না।

—তবে একটা কাঠের কমণ্ডলু দাও।

পথেই তীর্থরাজ গয়া। মথুরের ইচ্ছা গয়া দর্শন করেন। রামকৃষ্ণ রাজী হোলেন না। বললেন, না, আমার সেখানে যাওয়া হবে না। যেখানে থেকে এসেছি সেখানে গেলে শরীরটা থাকবেনা।

তখন সকলে কাশীধাম থেকে দক্ষিণেশ্বরে ফিরলেন।

১০

তীর্থদর্শন করে ফেরার পর একে একে আরো তিনটি বছর কেটে গেল। এই সময়ের মধ্যে তিনি অম্বিকা-কাল্‌না আর নবদ্বীপ দর্শনে গিয়েছিলেন। অম্বিকা-কালনায় তখন সিদ্ধমহাপুরুষ ভগবানদাস বাবাজী বাস করতেন। সঙ্গে ছিলেন ভক্ত মথুর আর হৃদয়। দক্ষিণেশ্বর থেকে তাঁরা নৌকায় করেই গিয়েছিলেন। কালনায় আসার পরের দিন সকালেই পরমহংসদেব হৃদয়ের সঙ্গে গেলেন বাবাজী দর্শনে।

যখন তারা দুজনে এসে উপস্থিত হোলেন, বাবাজী তখন জপ করছিলেন। বয়স আশীর কাছাকাছি, ফর্সা রং, মাথা কামানো, মাঝখানে টিকি। দুজনে কাছে এসে প্রণাম করে বসলেন। বাবাজী জিজ্ঞাসা করলেন, কোথা থেকে আসছেন ?

—কোলকাতা থেকে, উত্তর দিলেন হৃদয়।

রামকৃষ্ণকে দেখে বাবাজীর মনে হোল ইনি যেন সাক্ষাৎ মহাপ্রভু। ভাবাবজায় ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন, তুমি ভগবান দাস ?

—আমি আপনার দাস।

বাবাজীর আশ্রমের দুরবস্থা দেখে ঠাকুর মথুরকে আদেশ করলেন —বাবাজী সিদ্ধপুরুষ। মথুর ওঁর ঠাকুরের সেবার জন্য কিছু টাকা দান করো।

মথুর দিলেন একশো টাকা।

কালনা থেকে তাঁরা এলেন শ্রীধাম নবদ্বীপে।

নৌকা নবদ্বীপের কাছাকাছি হওয়া মাত্র রামকৃষ্ণ ভাবে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে পড়লেন। ভাবনেত্রে তিনি যেন দেখতে পেলেন দুটি অতি সুন্দর কিশোর, গলায় ফুলের মালা আকাশ পথে তাঁর দিকে নাচতে নাচতে আসছে। তাঁরা এসে তাঁর দেহে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ লুপ্ত হোল। নবদ্বীপে উপস্থিত হয়ে তিনি আবার ভাবাবেশ মুক্ত হোলেন। ঘাটে নেমে, আখড়াগুলি ঘুরে ঘুরে দেখলেন, কিন্তু কোথাও তাঁর ভাবাবেশ হোল না। ফিরে এলেন ঘাটে।

—কেমন দেখলে বাবা?

—দেখলুম সেসব স্থান আর নেই। লোপ পেয়ে গেছে।

একাদিক্রমে চৌদ্দ বছর ঠাকুরের সেবা করার পর মথুরবাবু মারা গেলেন। ফোড়ায় তিনি যখন শয্যাগত ছিলেন সেই সময় হৃদয় একদিন তাঁকে বললেন, মামা, একবার সেজবাবুকে গিয়ে দেখে এসো না?

—আমি গিয়ে কি করব? তার ফোড়া আরাম করে দেওয়ার শক্তি কি আমার আছে?

ঠাকুর এলেন না দেখে, রোগশয্যা থেকে মথুর লোক পাঠিয়ে বার বার কাতর প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। তাঁর ঐ রকম ব্যাকুলতায় রামকৃষ্ণ এলেন একদিন জানবাজারে। ঠাকুরকে দেখে মথুরের আনন্দের সীমা নেই। অনেক কষ্টে উঠে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বললেন তিনি। বললেন, "বাবা, একটু পায়ের ধূলো দাও।"

—আমার পায়ের ধূলো নিয়ে কি হবে? তাতে তোমার ফোড়া কি সারবে?

—বাবা, আমি কি ফোড়া আরামের জন্য তোমার পায়ের ধূলো

চাইছি? সেজন্য তো ডাক্তার আছে। আমি ভবসাগর পার হওয়ার জন্য তোমার শ্রীচরণের ধূলো চাইছি।

এইকথা শোনামাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হোলেন।

সেই অবসরে মথুর তাঁর পায়ে মাথা রেখে নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করলেন—তাঁর দুই চোখ বেয়ে দরদর ধারে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে পরমহংসদেব যখন স্বাভাবিক আস্থা ফিরে পেলেন তখন তিনি দেখলেন মথুরের খুব প্রসন্নভাব, রোগের বিন্দুমাত্র যন্ত্রণা সেখানে নেই। সেই সময়ে মথুর তাঁকে বললেন, বাবা, তুমি একদিন আমাকে বলেছিলে যে, আমি যতদিন বাঁচবো তুমি ততদিন দক্ষিণেশ্বরে থাকবে। আমি ত চললাম, তবে কি আমার অবর্তমানে আমার পরিজনদের তুমি ত্যাগ করবে?

ঠাকুর নিরুত্তর।

মথুর আবার দীনভাবে বললেন, বাবা, দ্বারকানাথ ও জগদম্বাও যে তোমাকে ভক্তি করে।

দ্বারকানাথ মথুরের পুত্র। তাঁর কাতরতা দেখে রামকৃষ্ণ আর স্থির থাকতে পারলেন না। বললেন, আচ্ছা, তোমার পত্নী ও দোয়ারি যতদিন থাকবে আমি ততদিন দক্ষিণেশ্বরে থাকব।

মথুর নিশ্চিন্ত হোলেন।

আর একটা সংশয় ছিল তার মনে। আজ রোগশয্যায় ঠাকুরকে কাছে পেয়ে তিনি বললেন, কই বাবা, তুমি যে বলেছিলে, তোমার ভক্তগণ আসবে, তাঁরা কেউই তো এখনো এলেন না?

—কি জানি বাবু, মা তাদেরকে কতদিনে আনবেন। তারা সব আসবে, এ কথা মা কিন্তু নিজে আমাকে জানিয়েছেন।

ঠাকুরের দিব্য প্রকাশ হবে, ভক্তরা সব আসবে, এই বিশ্বাস নিয়ে ১২৭৮ সালের আষাঢ় মাসের একদিন অপরাহ্ণে কালীঘাটে গঙ্গার

তীরে ভক্ত মথুর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। সেদিন সেই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে হঠাৎ গভীর ভাবে নিমগ্ন হোতে দেখা গেল।

মথুরানাথের মৃত্যুর ছ মাস পরে দক্ষিণেশ্বরে এলেন সারদাদেবী। লোকমুখে তিনি শুনেছিলেন তাঁর স্বামী উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন। এই খবর পেয়ে অবধি তাঁর মনে অশান্তির সীমা রইল না। তিনি তখন জয়রামবাটীতে বাপের বাড়ি ছিলেন।

—বাবা আমি দক্ষিণেশ্বরে যাব, একদিন বললেন সারদাদেবী এইকথা তাঁর বাবাকে।

বিয়ে হয়ে অবধি মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যায় না। এখন সে বড়ো হয়েছে। তাই আজ তার মুখে এইকথা শুনে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আর স্থির থাকতে পারলেন না। নিজেই মেয়েকে সঙ্গে করে একদিন যাত্রা করলেন দক্ষিণেশ্বরের উদ্দেশে। পাল্কী ছুটলো কোলকাতার পথে। তখন সারদাদেবীর জ্বর। রাস্তায় জলঝড়ে মহা দুর্যোগ উপস্থিত হোল। পথের অনেক কষ্ট সহ্য করে মেয়েকে নিয়ে রামচন্দ্র যখন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হোলেন তখন রাত একটা।

অসুস্থা পত্নীকে সাদরে গ্রহণ করলেন রামকৃষ্ণ।

নিজের ঘরেই পৃথক শয্যায় তাঁর শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন; ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থারও ত্রুটী হোল না। আজ মথুরানাথ বেঁচে নেই-সেই কথা স্মরণ করে ঠাকুর বারবার বলতে লাগলেন, এতদিনে তুমি এলে? আর কি আমার সেজবাবু আছেন যে, তোমার যত্ন হবে?

স্বামীর সাদর-সম্ভাষণে সারদাদেবী আনন্দে গলে গেলেন; পথ-শ্রমের ক্লান্তি, রোগের যন্ত্রণা, কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিন-চার দিনের মধ্যেই তিনি আরোগ্যলাভ করলেন। চন্দ্রাদেবী তখন নহবত-ঘরে বাস করতেন। ঠাকুর তাঁকে মায়ের কাছে রাখার বন্দোবস্ত করে দিলেন। জননী চন্দ্রাদেবীর আগ্রহে বধূ দক্ষিণেশ্বরে তাঁর

কাছেই রইলেন। নিজের চোখে জামাইয়ের খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা এবং মেয়ের শ্বাশুড়িকে এখানে নিরুদ্বেগে পরমশান্তিতে বাস করতে দেখে, সারদাদেবীর পিতা নিশ্চিন্তমনেই জয়রামবাটীতে ফিরে গেলেন।

সারদাদেবীও এখন প্রত্যক্ষ করলেন যে, না, তাঁর স্বামী পাগলও নয়, উন্মাদও নয়। পাগল কি নিজের হাতে বৌ-কে ওষুধ খাওয়ায়, না, তার অমন সেবা-শুশ্রূষা করে? লোকের মুখে শুনে এতকাল যে সন্দেহ তাঁর মনের মধ্যে জেগেছিল, এখন স্বচক্ষে সব দেখে সে সন্দেহ দূর হোল। সারদাদেবী মনেপ্রাণে বুঝলেন, ঠাকুর আগে যেমন ছিলেন, এখনো সেইরকম আছেন। লোকে তাঁর বিষয়ে মিথ্যা কথা রটনা করেছে। দেবতা দেবতাই আছেন।

এবার দক্ষিণেশ্বরে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হোতে চললো। ঠাকুর বিবাহিত জেনে বেদান্তসিদ্ধ তোতাপুরী একদিন বলেছিলেন, "তাতে কি হয়েছে? স্ত্রী কাছে থাকলেও ত্যাগ, বৈরাগ্য ও বিবেক যার ঠিক থাকে, সে মানুষের ব্রহ্মও ঠিক থাকে। যার দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষ সমান তার আবার ভয় কি?"

আজ দক্ষিণেশ্বরে এই পরীক্ষারই এক নতুন অধ্যায় উপস্থিত হোল। বিশ্ববরেণ্য সাধকের জীবনে আজ দেখা দিল এক অগ্নিপরীক্ষা।

একদিন।

স্বামীর পদসেবা করছেন সারদাদেবী।

ভাবময় ঠাকুর সেই সুযোগে সহধর্মিনীকে কত ভাল ভাল উপদেশ দিলেন; স্ত্রী সরল মনে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেন আর তিনি এতটুকু বিরক্ত না হোয়ে প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব দিতে থাকেন। শুধু তাই নয়। উপদেশের মর্ম ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পারছেন কিনা, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতেন তিনি।

—আচ্ছা সকলেরই কি ঈশ্বর দর্শন হয় ?

—হয় বৈ কি। চাঁদা মামা শিশুর মামা, তেমনি ঈশ্বর সকলেরই আপনার। তাঁকে ডাকবার অধিকার সকলেরই আছে। যে ডাকবে, তিনি তাকেই দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করবেন।

—আচ্ছা আমাকে তোমার কি বলে বোধ হয় ?

—যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন আর তিনিই আজকাল নহবতে বাস করছেন। এখন তিনিই আমার পদসেবা করছেন।

—সত্যি বলছ ?

—আমি মিথ্যা বলি না। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলে তোমাকে সর্বদা দেখি—সত্যি দেখি।

এই ভাবে এক বছর কেটে গেল।

এই একটি বছর একসঙ্গে বসবাস করেছেন তাঁরা দুজনে।

মনে জাগেনি বিকার একটি দিনের জন্যেও।

ভাঙেনি সংযমের বাঁধ।

এমনি ছিল তাঁর কঠোর তপস্যা।

মায়ের কৃপায় কেমন করে এই তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন রামকৃষ্ণ, সেই কথা বলি এইবার।

১২৮০। জ্যৈষ্ঠ মাস। অমাবস্যা।

আজ ফলহারিণী কালিকা পূজার পুণ্যদিন।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে প্রতি বছর এই দিনে বিশেষ উৎসব হয়। ঠাকুর জগদম্বাকে পূজা করবার মানসে আজ বিশেষ আয়োজন করেছেন। ঐ আয়োজন কিন্তু মন্দিরে না হোয়ে তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁর ঘরেই হোল। কেউ জানে না। পরমহংসদেব বসেছেন পূজায়। তাঁর পাশেই রয়েছে আলপনা-আঁকা একখানা পিঁড়ি। অমাবস্যার

ঘোর অন্ধকার রাত্রি। রাত তখন নটা বাজে। নহবত ঘরে খবর পাঠিয়ে তিনি সারদাদেবীকে আনালেন তাঁর ঘরে। স্ত্রীর হাত ধরে বসালেন তিনি আলপনা-আঁকা সেই পিঁড়িতে। স্বামীর দক্ষিণ পাশে বসে আছেন তিনি। বসে আছেন বিহ্বলচিত্তে। বসে আছেন মন্ত্রমুগ্ধার মতোন। সামনে মন্ত্রপূত গঙ্গাজলপূর্ণ কলস। সারদাদেবীর সর্বাঙ্গে সেই জল ছিটিয়ে তিনি অভিষেক করলেন তাঁকে। দুই পায়ে দিলেন আলতা পরিয়ে। সীমন্তে দিলেন সিঁদুর। পরিয়ে দিলেন একখানি নতুন বস্ত্র। এইবার ঠাকুর উচ্চারণ করলেন প্রার্থনা মন্ত্র ঃ

"হে বালে, হে সর্বশক্তির অধিশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরা সুন্দরি, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর। এঁর শরীর মনকে পবিত্র করে এঁর দেহে আবির্ভূতা হোয়ে সর্বকল্যাণ সাধন কর।"

তারপর সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে সারদাদেবীকে ষোড়শ উপাচারে পূজা করলেন। নিবেদন করলেন ভোগ। নিজের হাতে মুখে তুলে দিলেন নিবেদিত ভোগের কিছু অংশ। দেখতে দেখতে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন সারদাদেবী। ক্রমে সমাধিস্থ হোলেন তিনি। ঠাকুরের তখন অর্ধবাহ্যদশা। মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে তিনিও হোলেন সমাধিস্থ। বিচিত্র সেই দৃশ্য। বিচিত্র সেই অনুভূতি। দুজনে আত্মস্বরূপে মিলে যেন একীভূত হোলেন।

কতক্ষণ কেটে গেল এই দিব্যভাবে।

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর অতীত হয়েছে অনেকক্ষণ।

আত্মারাম ঠাকুর ধীরে ধীরে ফিরে পেলেন অর্ধবাহ্যদশা।

দেবীকে করলেন তিনি আত্মনিবেদন।

দিলেন তাঁর চরণে তাঁর সাধনার ফল আর জপের মালা।

প্রণাম করলেন তাঁকে এই বলে ঃ "হে সর্বমঙ্গলের মঙ্গল স্বরূপে, হে সর্বকর্ম নিস্পন্নকারিণি, হে শরণদায়িনি ত্রিনয়নী শিব গেহিনি গৌরি, হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম।"

পূজা শেষ হোল। অদ্ভূত অপরূপ মহাপূজা।
সহধর্মিনী হোলেন জগজ্জননী।
ঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি হোল আজ।
লাভ করলেন তিনি সম্পূর্ণভাবে দেব-মানবত্ব।

১১

জীবনব্যাপী সাধন-যজ্ঞ সম্পূর্ণ হোল।

অবসান ঘটল সর্বসাধনার।

রামকৃষ্ণের মনে জাগল এক অভিনব বাসনা—প্রবল উদ্দীপনা।

এবার প্রচার করতে হবে অমৃতবাণী।

সে বাণী হবে এযুগের সম্পূর্ণ উপযোগী।

সকল জাতি, সকল ধর্ম আর সকল সম্প্রদায়ের মানুষ গ্রহণ করবে সেই বাণী।

এরই জন্যে এখন দরকার একদল ঈশ্বর-বিশ্বাসী সর্বত্যাগী সত্যাশ্রয়ী ভক্ত। কোথায় তারা? কবে আসবে? তখনকার মনের অবস্থা বর্ণনা করে ঠাকুর নিজেই বলেছেন ঃ "তখন আমার ব্যাকুলতার সীমা ছিল না। দিনের বেলায় ঐ ব্যাকুলতা মনের মধ্যে চেপে রাখতাম কোন রকমে। বিধর্মী লোকের সঙ্গ তখন অসহ্য মনে হোত। তখন ভাবতাম—ভক্তরা এলে ঈশ্বরীয় কথা বলে প্রাণটা শীতল করব, কান জুড়োব আর নিজের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা তাদেরকে বলে হাল্কা করব মনের বোঝা।"

দিন যায়।

প্রত্যাশিত ভক্তরা আসে না দেখে রামকৃষ্ণের ধৈর্যের বাঁধ যেন ভেঙে যায়। বেড়ে ওঠে ব্যাকুলতা। মন্দিরে আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা

বেজে উঠতো, তখন কুঠির ওপরে উঠে হৃদয়ের যন্ত্রণায় অস্থির হোয়ে কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলতেন—"তোরা সব কে কোথায় আছিস, আয় রে! তোদের না দেখে আর থাকতে পারছি না। কোথায় তোরা সব সৈনিক-সন্ন্যাসী, চলে আয়। ওরে, আমি যে তোদের জন্যে কত কথা, কত ভাব, কত ভালবাসা নিয়ে কতদিন ধরে বসে আছি; তোরা চলে আয়, চলে আয়।"

তাঁর সেই আকুল চীৎকারে ভরে ওঠে দক্ষিণেশ্বরের আকাশ।

সকল সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর ঠাকুর যখন তাঁর ভাবী ভক্তদের জন্য দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করছিলেন, সেই সময়ে একদিন কামারপুকুর থেকে খবর এলো, রামেশ্বর মারা গেছেন। ঠাকুর দেখলেন এই দারুণ দুঃসংবাদ যদি মায়ের কানে যায়, তা হোলে চন্দ্রাদেবী ভীষণ আঘাত পাবেন। অমনি তিনি মন্দিরে গিয়ে ভবতারিণীর কাছে জানালেন কাতর প্রার্থনা—মা গো আমার বৃদ্ধ মাকে এই ভীষণ পুত্রশোক থেকে রক্ষা কর।

সিঁদুরিয়াপটীর শম্ভুচরণ মল্লিক।

খুব নাম ডাক তাঁর।

সওদাগরী অফিসের মুৎসুদ্দী তিনি। প্রচুর অর্থ উপার্জন করে থাকেন। সৎকাজেও প্রবৃত্তি যেমন, তেমনি আছে নানান রকম সখ ও বিলাসিতা। ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া-আসা করেন, কারণ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মনে গভীর সংশয়। এই রকম যখন তাঁর মনের অবস্থা, সেই সময় ঠাকুরের কথা তাঁর কানে এলো। তখনই এই বিশ্ববরেণ্য সাধকটিকে নিয়ে নানা স্থানে আলোচনা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, নানা সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর বিচিত্র কাহিনী। শম্ভুনাথও শুনলেন। দক্ষিণেশ্বরের কাছে আড়িয়াদহ গ্রাম। সেইখানে গঙ্গার তীরে তাঁর প্রকাণ্ড এক বাগানবাড়ি। সে বাড়ি আজো আছে।

একদিন শম্ভুনাথ বাগানবাড়ি চলেছেন।

যাওয়ার পথেই দক্ষিণেশ্বর।

মনটা হঠাৎ কেমন করে উঠল তাঁর—কী যেন একটা দিব্য আকর্ষণ বোধ করলেন তিনি। গাড়ি থামল ফটকের সামনে। ভিতরে প্রবেশ করলেন তিনি। রামকৃষ্ণ তখন তাঁর ঘরখানির মধ্যে বসে আছেন। ঈশ্বরীয় কথা বলছেন। একজনকে বলছেন—শাস্ত্রের দু'রকম মানে-এক শব্দার্থ ও মর্মার্থ। শেষেরটাই নিতে হয়—যে অর্থ ঈশ্বরের কথার সঙ্গে মিলে যায়। আমি তো মায়ের মুখের কথার সঙ্গে না মিললে কিছুই নিই না।

সুন্দর কথা। জ্ঞানের কথা। আর কত সরলভাবেই না বলা। শুনে চমৎকৃত হোলেন শম্ভুনাথ। তখনি ঠাকুরের পায়ের তলায় মাথা রেখে বললেন—দর্শন করতে এসেই সংশয়ভঞ্জনের পরম বাণী শুনলাম। আপশোষ হচ্ছে, আরো আগে আসিনি কেন? আর ছাড়ান-ছোড়ান নেই—আজ থেকে তুমিই আমার গুরু।

ঠাকুর তাঁকে নিজের হাতে স্পর্শ করে কাছে বসালেন। মৃদু হেসে বললেন, কে কার গুরু! হয়তো তুমিই আমার গুরু হয়ে এসেছ।

আলাপ জমে ওঠে। সেইদিন থেকে এই শম্ভুচরণ মল্লিকই হোলেন ঠাকুরের রসদদার—ভক্ত-ভাণ্ডারী। তাঁর ধর্মপ্রাণা স্ত্রী সারদাদেবীকে যথার্থ দেবীজ্ঞানে করতে লাগলেন আরাধনা।

কেশবচন্দ্র সেন তখন একজন বড় ব্রাহ্মনেতা।

ভক্ত এবং ভাবুক। ঈশ্বরপ্রেমিক। দিবারাত্র তাঁর কণ্ঠে উঠছে প্রার্থনার অমৃতবাণী। সারা বাংলা দেশে তখন তাঁর নাম। দিব্যকান্তি চেহারা আর অসাধারণ বাগ্মী। পরমহংসদেবের ইচ্ছা হোল এই কেশব সেনকে একবার দেখবেন। ঈশ্বরানুরাগী লোকের খবর পেলেই

তিনি তাকে দেখতে যেতেন। কেশব তখন অবস্থান করছিলেন বেলঘরিয়ার বাগানে। একদিন বিকেল তিনটের সময় হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে একখানা গাড়ি চড়ে রামকৃষ্ণ গেলেন কেশবকে দেখতে।

গাড়ি এসে থামল বাগানের সামনে।

হৃদয় আগে ভেতরে গেলেন। কেশব সেনের কাছে এসে তিনি বললেন, আমার মামা হরিকথা শুনতে ভালবাসেন। মহাভাবে তাঁর সমাধি হয়। তিনি আপনার মুখে ঈশ্বরের গুণকীর্তন শুনতে এসেছেন।

—আচ্ছা, তাঁকে ভেতরে আনুন।

রামকৃষ্ণ ছিলেন তখন ভাবের ঘোরে। হৃদয় তাঁকে ধরে ধরে ঘরের ভেতরে নিয়ে এলেন। রোগা শরীর, পরনে একখানা সামান্য লাল-পেড়ে ধুতি, কোঁচার খুঁটটি কাঁধে ফেলা। দেখলেই মনে হবে একজন সামান্য লোক—সাধারণ মানুষ। ঠিক সেই ধারণাই হোল উপস্থিত সকলের।

—বাপু, তোমরা নাকি ঈশ্বরদর্শন করে থাকো? সে কি রকম দর্শন তা জানতে এসেছি।

এই কথা বলে ভাবময় পরমপুরুষ নিজেই আরম্ভ করলেন ঈশ্বর-প্রসঙ্গ। বললেন নিজের অভিজ্ঞতার কথা। তারপর কিন্নর-কণ্ঠে গাইলেন রামপ্রসাদের সেই বিখ্যাত গানটি—'কে জানে কালী কেমন?' সে গান শুনলে পাষাণও গলে যায়। চারদিকের আবহাওয়ায় যেন ছোঁয়া লাগল একটা বিশুদ্ধ ভাবের। সেই প্রেমানন্দ বিকশিত মুখকান্তি, সেই প্রাণস্পর্শী মধুর কণ্ঠস্বর সকলের মন হরণ করল। হরণ করল মন কেশবের—জাগল তাঁর প্রাণে এক দিব্য অনুভূতি।

গান গাইতে গাইতে সমাধিস্থ হোলেন ঠাকুর।

দৃষ্টি স্পন্দনহীন, স্থির।

মুখখানি হাস্যময়।

আধ-বোঁজা চোখ দুটি রক্তাভ।

কতক্ষণ পরে সমাধি ভাঙল। ঠাকুর হেসে উঠলেন। বললেন—ঈশ্বরের রূপ অনন্ত। তিনিই সাকার আবার তিনিই নিরাকার। তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি। এ ছাড়া তাঁর আরো কত রূপ আছে, কে জানে ?

এইভাবে ভাবের ঘোরে ছোট ছোট কথায় বড় বড় তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। কেশব ও তাঁর ভক্তরা সকলে স্থির হয়ে সেই অমৃতধারা পান করতে লাগলেন।

—তোমরা নাকি শক্তি মানো না ? শক্তিকে না জানলে ব্রহ্মকে জানবার জো নেই। শক্তি আর ব্রহ্ম অভেদ। যেমন আগুন আর তার দাহিকা শক্তি। একটি ভাবলে আর একটি ভাবতে হয়। মণি আর তার আভা।

কেশব মুগ্ধ। মুখে তাঁর কথা নেই। ইনি তো দেখছি ঈশ্বর-জানা লোক—ভাবলেন তিনি। অবশেষে পরমহংসদেব হাসতে হাসতে কেশবকে লক্ষ্য করে বললেন—তোমার ল্যাজ খসেছে। সেই অদ্ভুত কথা শুনে সবাই হাসতে থাকে।

—তোমরা হাসছ কেন ? এ কথার নিশ্চয়ই কোন মানে আছে। বললেন কেশব।

—ছাখো যতদিন ব্যাঙাচির ল্যাজ থাকে ততদিন সে জলেই থাকে। তারপর ল্যাজ খসে গেলে সে জলেও থাকতে পারে, ডাঙায়ও থাকতে পারে। তেমনি মানুষের অবিদ্যা ল্যাজ যতদিন থাকে ততদিন সে সংসাররূপ জলে থাকে। তা তোমার সে অবিদ্যারূপ ল্যাজ খসেছে।

এই সাক্ষাতের পর থেকে কেশব পরমহংসদেবের প্রতি আকৃষ্ট হোলেন এবং মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে যেতে থাকেন। তাঁর সঙ্গে

আসেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ত্রৈলোক্য সান্যাল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম ভক্তরা। আরো অনেকেই আসেন।

১৮৭৫। মে মাস।

তাঁর 'ইণ্ডিয়ান মিরার' কাগজে পরমহংসদেবের কথা লিখলেন কেশব। 'ধর্মতত্ত্বে' বেরুলো তাঁর জীবনী। তখন থেকেই জনসমাজে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কেশব সেনের সঙ্গে মিলনের পর কেথেই রামকৃষ্ণের জীবনে শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়। এতদিন যাঁরা তাঁর কাছে যেতেন তাঁরা সবাই বয়স্ক লোক। এখন তরুণদের যাওয়া আসা আরম্ভ হোল। আসতে লাগলেন শিক্ষিতের দল।

১৮৭৯। ফাল্গুন মাস।

আজ রামকৃষ্ণের জন্মতিথি।

চন্দ্রাদেবীর মৃত্যু হোল। মায়ের যখন নাভিশ্বাস উঠল তখন পরমহংসদেব ফুলচন্দন তুলসী দিয়ে তিনবার তাঁর পায়ে অঞ্জলি দিলেন। ভাইপো রামলাল মুখাগ্নি করলেন। মায়ের আত্মার সদ্গতির জন্য তিনি ভবতারিণীর কাছে প্রার্থনা জানালেন। সন্ন্যাস নিয়েছিলেন বলে তিনি তর্পণ করতে পারেননি।

একদিন।

পরমহংসদেব বসে আছেন তাঁর ঘরে। দরজা বন্ধ।

এমন সময় কে যেন দরজায় করাঘাত করল।

ঘরের মধ্যে ঠাকুর একলাই ছিলেন। তিনিই উঠে দরজা খুলে দিলেন। দেখলেন সামনে দুজন বাঙালী যুবক। আলাপ করে জানলেন তাঁরা ব্রাহ্মসমাজের লোক নন। তখন তিনি হৃদয়কে ডেকে বললেন, ওরে হৃদু, এরা ব্রাহ্মসমাজের লোক নয় রে। তুই আয়, এদের মধ্যে একজন ডাক্তার। তোর হাতটা দেখা না একবার।

হৃদয় তখন কিছুদিন হয় জ্বরে ভুগছিলেন।

যে দুজন এসেছিলেন এঁদের মধ্যে একজনের নাম রামচন্দ্র দত্ত, অন্যজনের নাম মনোমোহন মিত্র। এঁরা থাকেন কোলকাতার সিমুলিয়াতে। এই রামদত্ত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের দূর সম্পর্কের কাকা। দুজনেই চাকরি করেন। রবিবার ছাড়া এঁদের অবসর নেই। হৃদয় এলে পরে ডাক্তার মনোমোহন মিত্র তাকে পরীক্ষা করে বললেন জ্বর নেই। সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় তাঁরা উঠলেন। পরমহংসদেব বললেন, একটু দাঁড়াও, মার প্রসাদ খেয়ে যাও। তাঁরা প্রসাদ গ্রহণ করে বিদায় নিলেন। দরজা পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে এলেন ঠাকুর ; বললেন, আবার এসো, আবার এসো।

এখন থেকে শনিবার ও রবিবারে দক্ষিণেশ্বরে বহু লোকের ভীড় হোতে থাকে। সকলেই আসেন রামকৃষ্ণকে দেখার জন্য। যা ছিল এতকাল শুধুই কালীমন্দির, সেই স্থানটি এখন সর্বদা ঈশ্বরের কথায় ও কীর্তনে গম্ গম্ করছে। রামচন্দ্র ও মনোমোহনের সঙ্গে একদিন এলেন সুরেন মিত্র। ইনিও সিমুলিয়ায় থাকতেন। এক ইংরেজ সওদাগরী অফিসে মুচ্ছুদ্দির কাজ করতেন। তিনি এসেছিলেন নিছক কৌতূহল নিয়ে, ফিরে গেলেন গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে।

আর একদিনের কথা।

পরমহংসদেব বারান্দায় পায়চারী করছেন।

এমন সময় সেখানে একটি পশ্চিম-দেশীয় বালক এসে উপস্থিত হোল। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলো তাঁকে।

—কী নাম ?

—লাটু।

—বাড়ি কোথায় ?

—ছাপরা জেলায়।

—এখানে কোথায় থাকিস ?

—সিমুলিয়ায় রাম দত্তের বাড়িতে।

—রোদে তোর মুখখানা পুড়ে গেছে দেখছি, আয় ভেতরে আয়।

লাটু ভেতরে এলেন। ঠাকুর তার জলযোগের ব্যবস্থা করলেন। যে শ্রেণীর ভক্তদের জন্য এতদিন প্রত্যাশায় ছিলেন তাঁদেরই একজন এই বালক। উত্তরকালে ইনিই রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীতে 'লাটু মহারাজ' নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। কিন্তু আর সব ছেলেরা কোথায় ? কবে তারা আসবে ?

চন্দ্রাদেবীর মৃত্যুর খবর যখন পেলেন সারদাদেবী তখন থেকে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সেই ষোড়শী পূজার পর তিনি কামারপুকুরে ফিরে গিয়েছিলেন। লোকমুখে খবর পেলেন স্বামীর শরীর সুস্থ নয়, পেটের অসুখ। সেই যে তিনি জগদম্বা দাসীর অসুখ নিজের শরীরে গ্রহণ করেছিলেন, সেই থেকেই এই অসুখ। না জানি তাঁর সেবা-শুশ্রূষার কত অসুবিধা হচ্ছে—এই কথা যতই তিনি চিন্তা করতে থাকেন ততই দক্ষিণেশ্বরে আসার জন্য ব্যস্ত হোলেন সারদাদেবী। সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকেন।

এলো একটা যোগের পর্ব।

গঙ্গাস্নানে যাবেন গ্রামের কয়েকজন নরনারী। শুনলেন লক্ষ্মীও যাবে বৈদ্যবাটীতে গঙ্গাস্নান করতে। লক্ষ্মী ঠাকুরের ভাইঝি। সারাদাদেবী তাঁদের সঙ্গে যাত্রা করলেন। বৈদ্যবাটীর ঘাটে স্নান করা শেষ হোলে আর সকলে কামারপুকুরে ফিরে গেল ; লক্ষ্মীকে সঙ্গে নিয়ে সারদাদেবী এলেন দক্ষিণেশ্বরে। উঠলেন নহবতের ঘরে। তাদের আগমনে খুব খুশি হোলেন রামকৃষ্ণ। স্বামীর শীর্ণ শরীর দেখে শংকিত হন সহধর্মিণী।

—এ কী এত রোগা হয়ে গিয়েছ তুমি ?

জিজ্ঞাসা করলেন তিনি। সারদাদেবীর কণ্ঠস্বরে অনুরাগ আর আকুতি। জগদম্বার রোগ আমার শরীরে—উত্তর দিলেন ঠাকুর। পেটের অসুখ, জ্যান্ত মাছের ঝোল আর সরুচালের ভাত—এ ছাড়া অন্য কিছু খেতে নিষেধ।

তখন থেকে স্বামীর সেবায় প্রাণ ঢেলে দিলেন সাধ্বী। এমন নিঃশব্দে রইলেন যে কেউ জানতেই পারল না যে তিনি সেখানে বাস করছেন।

১২

দিনে দিনে শতদলের মতোন বিকশিত হয়ে ওঠে রামকৃষ্ণ-মহিমা। দলে দলে জিজ্ঞাসু ও ধর্মপিপাসুর দল ছুটে আসে দক্ষিণেশ্বরে। শতাব্দীর পটে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এক দেবমানবের দিব্য-প্রকাশ। ধর্মের জগতে দেখা দিলো এক নতুন আলো, নতুন চেতনা। বহু সিদ্ধ-সাধকের যুগ-যুগান্তের সাধনা-পূত বাংলার মাটীতে দেখা দিলো এক অলৌকিক সাধনার বিচিত্র বিভা।

অর্ধশিক্ষিত সেই পূজারী ব্রাহ্মণ আজ বিশ্ব-বন্দিত সাধক।

গদাধর আজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

কলুটোলার হরিসভা উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন রামকৃষ্ণ। সুবিস্তীর্ণ সুসজ্জিত সভামণ্ডপ। বিরাট আসর। সে আসরে বসে আছেন শহরের সকল শ্রেণীর ধনী, সুধী ও ভক্তগণ। মণ্ডপের সামনে একটি উঁচু বেদীর ওপর শোভা পাচ্ছে সুগন্ধি পুষ্পস্তবকে সজ্জিত একটি আসন। প্রেমাবতার মহাপ্রভুর আসন। ভক্তরা কল্পনায় দেখেন, মহাপ্রভু স্বয়ং সেই পবিত্র আসনে বসে হরিকথা শুনছেন।

ঠাকুর এলেন সভামণ্ডপে।

আসামাত্রই তিনি হয়ে পড়লেন ভাবাবিষ্ট।

ভাবের আবেগে বেদীর দিকে চলেছেন ভাবময় পুরুষ।

সোজা গিয়ে তিনি বসে পড়লেন বেদীর ওপরে স্থাপিত মহাপ্রভুর

সেই আসনে। বসবার সঙ্গে-সঙ্গেই ভাব-সমাধি। উপস্থিত সকলেই সেই কাণ্ড দেখে বিস্ময়ে স্তব্ধ, অভিভূত—কারো মুখে কথা নেই। বৈষ্ণবদের মধ্যে ওঠে অস্পষ্ট প্রতিবাদের গুঞ্জন। কে এই উন্মাদ যে এসে বলা নেই কওয়া নেই বসে পড়ল শ্রীচৈতন্যাসনে! কিন্তু কী আশ্চর্য, লোকটা বসেই ভাব-সমাধিতে ডুবে আছে।

কে একজনে বললে—হরিকীর্তন আরম্ভ করে দিন।

তাই হোল। কীর্তন আরম্ভ হতেই রামকৃষ্ণের চৈতন্যোদয় হয়। পরক্ষণেই সেই পবিত্র আসনের ওপর দাঁড়িয়ে ভাবাবেগে তিনি নাচ্‌তে আরম্ভ করলেন। সে অপূর্ব নৃত্যের ভঙ্গি দেখে ভক্তদের চোখে পলক পড়ে না। স্বয়ং মহাপ্রভুই বুঝি এঁর দেহে আজ আবির্ভূত হয়ে এই ভাব-নৃত্যে মত্ত হয়েছেন। বিরক্তির বদলে এখন তাদের মনে জাগল শ্রদ্ধা। নির্বাক বিস্ময়ে সবাই তাকিয়ে আছে সেই আশ্চর্য মানুষটির দিকে। ভাববন্যায় হরিসভা টলমল।

সামধ্যায়ী বলে একজন ছিলেন হরিসভার আচার্য।

তিনি আরম্ভ করলেন ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ।

বললেন—ঈশ্বর নীরস, আমাদের প্রেম-ভক্তি দিয়ে তাঁকে সরস করে নিতে হবে।

—তুমি যে অবাক্ করে দিলে গো? বলে উঠলেন রামকৃষ্ণ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে।

—হ্যাঁ, ঈশ্বর নীরসই তো।

—না, কথ্‌খনো না। তিনি রসস্বরূপ। তুমি অনুভবই কর নি ঈশ্বর কি জিনিস।

হরিসভার আচার্যের মুখে আর কথা নেই।

দিন যায়।

দিব্যভাবের পূর্ণ প্রকাশ একে একে আকর্ষণ করে নিয়ে আসে

ঠাকুরের চিহ্নিত ভক্তদের। দ্বাদশ বৎসরের কঠোর সাধনা শতাব্দীর পটে নিঃশব্দে লিখে চলে এক নতুন ইতিহাস। সর্বসাধনায় সিদ্ধ ঠাকুর যখন ভাবী ভক্তদের জন্য দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করছিলেন, তখন একে একে আসতে লাগলেন সংসারের আকর্ষণ ছিন্ন করে সন্ন্যাসী-সৈনিকের দল। এলেন বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, প্রেমানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, অদ্বৈতানন্দ, ত্রিগুণাতীত, অদ্ভুতানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, তুরীয়ানন্দ, সারদানন্দ, শিবানন্দ, অভেদানন্দ, অখণ্ডানন্দ, সুবোধানন্দ, নির্মলানন্দ ও বিজ্ঞানানন্দ। দক্ষিণেশ্বরের তপোবনে শুরু হয় আত্মনিবেদনের পালা। এঁরাই পরে রামকৃষ্ণের লীলা-সহচর, শিষ্য ও পরমভক্তরূপে খ্যাতিলাভ করেন। সেদিন ঠাকুরের কী আনন্দ। হৃদয়কে ডেকে বললেন—আমার আপন-জন সব আসছে রে! কামারপুকুর-পল্লীর সেই অখ্যাত বালক গদাধর আজ রামকৃষ্ণ পরমহংসরূপে ধর্মের জগতে নিয়ে এলেন নতুন যুগ-চেতনা।

একদিন।

পরমহংসদেব এসেছেন কোলকাতায় সুরেন মিত্তিরের বাড়িতে। তিনি এসেছেন শুনে সেখানে এলেন রাম দত্ত, মনোমোহন ডাক্তার, তাঁর ভগ্নীপতি রাখাল। এই রাখাল ঘোষই ছিলেন ঠাকুরের মানস-পুত্র, স্বামী ব্রহ্মানন্দ। ঠাকুর গান শুনতে চাইলেন। কে গান গাইবে? রাম দত্ত তখন ডেকে নিয়ে এলেন তাঁর মামাতো ভাই নরেন্দ্রনাথ দত্তকে। নরেন ভাল গান গায়। সে ব্রাহ্মসমাজের খাতায় নাম-লেখানো সভ্য। নরেনের গান শুনে ঠাকুরের ভাব-সমাধি হোল। নরেনের বয়স তখন উনিশ বছর। সুন্দর টানা-টানা রক্তাভ চোখ, চোখ থেকে ফুটে বেরুচ্ছে প্রতিভা।

—ছেলেটি কে?

—আমার মামাতো ভাই।

—সামনের রবিবারে একে একবার দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যেও।

(এ্যাটর্ণি বিশ্বনাথ দত্তের বড়ো ছেলে নরেন্দ্রনাথ দত্ত—ইংরেজী-শিক্ষিত নাস্তিক কিন্তু সত্যনিষ্ঠ যুবক নরেন্দ্রনাথই পরবর্তীকালে বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দরূপে বাংলা তথা ভারতবর্ষে কী উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলেন সে কাহিনী সকলেরই অল্প-বিস্তর জানা আছে। তিনিই দেশ-দেশান্তরে প্রচার করেন রামকৃষ্ণের সমন্বয়ের বাণী। দক্ষিণেশ্বরে প্রথম যেদিন নরেন্দ্রনাথ আসেন সেদিন তাঁকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে তাঁর হাত দুখানি ধরে পরম স্নেহে ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, এতদিন বাদে এলি? আমি যে তোর জন্যে প্রতীক্ষা করে রইছি, সে কথা কি তোর একবারও মনে হয়নি? কিছুক্ষণ বাদেই নরেন্দ্রের সামনে করযোড়ে দাঁড়িয়ে রামকৃষ্ণ বলেন, জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ। জীবের দুর্গতি নিবারণ করতে আবার শরীর ধারণ করেছ।

এ ঘটনা ১৮৮৩ সনের।)

তারপর যে কয় বছর রামকৃষ্ণ এই সংসারে ছিলেন সেই সময়ে নরেন্দ্রনাথকে তিনি ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মন্ত্র দান করে, শিবজ্ঞানে জীবপূজার আদর্শের পরম বাণী দান করে তাঁর ভাবী জীবনের সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। নিত্যশুদ্ধ নরেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দ-রূপে ভারতের যে অশেষ কল্যাণ সাধনা করে গিয়েছেন, তা তিনি করেছিলেন তাঁরই ইষ্টদেব পরমহংসের দিব্য প্রেরণায়।

এইসব চিহ্নিত সন্তানের দল আসতেই দক্ষিণেশ্বরে শুরু হয় আনন্দের হাট। তখনকার কোলকাতায় এমন কোন শিক্ষিত ও ধর্মপিপাসু ব্যক্তি ছিলেন না যিনি রামকৃষ্ণ-দর্শনে এখানে না এসেছেন। (যাঁরা আসেননি ঠাকুর নিজে তাদের কাছে গিয়েছেন—যেমন বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র।) এইভাবেই একদিন তাঁর কাছে এসেছিলেন তাঁর অন্যতম গৃহীভক্ত বলরাম বসু। বাগবাজারে তাঁর প্রকাণ্ড বাড়ি। জমিদার মানুষ। এই বলরাম বসুকেই ঠাকুর বলেছিলেন—ওগো

মা বলেছেন, তুমি যে আমার আপনার লোক। তুমি যে মা'র একজন রসদ্দার। সত্যিই তাই। মথুরবাবু মারা যাওয়ার পর পাথুরিয়া-ঘাটার শম্ভু মল্লিক আর বাগবাজারের বলরাম বসু—এই দুই ভক্তই ছিলেন ঠাকুরের রসদ্দার।

প্রথম যেদিন বিনা পরিচয়ে বলরাম বসু দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন সেদিন তিনি ঠাকুরকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—মশাই ভগবান্ কি আছেন?

—হ্যাঁ, ভগবান আছেন বৈ কি?

—তাঁর দর্শন পাওয়া যায় কি?

—তাঁকে আপনার ভেবে ডাক্‌লে তিনি দেখা দেন। এক ডাকে দেখা না পেলে ভাবতে নেই যে তিনি নেই। দিনের বেলায় নক্ষত্র দেখা যায় না, তা বলে কি বল্‌বে আকাশে নক্ষত্র নেই?

—তবে তাঁকে এত ডাকি, কিন্তু তাঁর দর্শন পাই না কেন?

—নিজের ছেলে-মেয়েদের ওপর যেমন টান আছে, তেমনি আপন ভেবে ডাক কি?

—আজ্ঞে না, সেরকম ভাবে ডাকিনি।

—আপনার হোতেও আপনার ভেবে তাঁকে ডাকো। নিশ্চয় বলছি তিনি ভক্তবৎসল, দেখা না দিয়ে থাকতে পারবেন না।

—সত্যি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ আমি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, শাস্ত্র পড়ে নয় বা লোকের মুখে শুনেও নয়। মানুষ তাঁকে ডাকার আগে তিনি এগিয়ে আসেন!

—বলেন কি!

—হ্যাঁ, ঠিক বলছি। মানুষ যদি এক পা এগোয়, তিনি দশ পা এগিয়ে আসেন। তাঁর চেয়ে আপনার জন এ সংসারে আর কেউ নেই।

প্রথম সাক্ষাতেই পরমহংসদেবের মুখে এইসব কথা শুনে বলরামের মন শীতল হয়েছিল। এর পরের দিন বলরাম নিজে বাজারে গিয়ে জিনিসপত্র কিনলেন এবং গাড়ি করে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হোলেন। রামকৃষ্ণ খুব খুশি। হৃদয়কে ডেকে বললেন, এঁর আনা প্রত্যেকটি জিনিস বড় পবিত্র। ইনি মায়ের আপনজন। আজ ঐ দিয়ে ভোগ রাঁধতে দিস। বেশ ভাল করে রাখিস।

সেই থেকে পরমহংসদেবকে দর্শন করতে বলরাম প্রত্যহ সকালে দক্ষিণেশ্বরে আসতেন। আর সেই অধধি প্রত্যেক বছর রথের সময় বলরাম ঠাকুরকে তাঁর বাগবাজারের বাড়িতে নিয়ে যেতেন। তাঁর ৫৭ নম্বর রামকান্ত বসুর স্ট্রীটের বাড়িতে ঠাকুরের যে কতবার শুভাগমন হয়েছে তা বলা যায় না। কত লোকই যে এখানে তাঁকে দর্শন করে ধন্য হয়েছে, কে তার ইয়ত্তা করবে ? বলরাম বসুর বাড়ি ছিল, তাঁর নিজের কথায়, মা কালীর দ্বিতীয় কেল্লা। প্রথম কেল্লা ছিল দক্ষিণেশ্বর।

শুধু যে পুরুষ ভক্তগণ তাঁর কৃপা পেয়েছিলেন তা নয়। ভক্তিমতী অনেক নারীও তাঁকে দর্শন করে কৃতার্থ হয়েছিলেন। ঠাকুর যখনই বলরাম বসুর বাড়িতে আসতেন তখন সেখানে অন্দর মহলে স্ত্রীভক্তেরা আসতেন। এইসব সতী-সাধ্বী ও ভক্তিমতী স্ত্রীলোকদের সঙ্গে কামগন্ধহীন ঠাকুরের যে কি এক মধুর সম্পর্ক ছিল তা বলে বুঝাবার নয়। ওঁদের অনেকেই ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ইষ্টদেবতা বলে মনে মনে জানতেন। সকলেরই ঠাকুরের ওপর একরকম বিশ্বাস।

এঁদেরই মধ্যে পরম ভাগ্যবতী ছিলেন অঘোরমণি দেবী।

কামারহাটির এক বামুনের মেয়ে।

সবাই ডাকতো গোপালের মা বলে।

তাঁর ছিল গোপালভাব কত কি দর্শন হয়েছে।

গোপাল তাঁর কাছে হাত পেতে খেতে চায়।

একদিন ভাবে প্রেমে উন্মাদ হয়ে দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন গোপালের মা। ঠাকুর তাঁকে খাওয়াতে দাওয়াতে একটু ঠাণ্ডা হোল। তিনি থাকতে বললেন, কিন্তু তিনি থাকলেন না। যাওয়ার সময়ও সেইরকম উন্মাদ অবস্থা—গায়ের কাপড় মাটীতে লুটিয়ে যাচ্ছে, হুঁশ নেই। তিনি আবার কাপড় তুলে দিয়ে বুকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

একদিন।

ঠাকুর আছেন বলরামের বাড়িতে।

গোপালের মার কথা উঠলো। ঠাকুর বললেন, ওর খুব ভক্তি বিশ্বাস। তাকে এখানে আনতে পাঠাও না একবার।

গাড়ি গেল কামারহাটি গোপালের মাকে আনতে।

ত্বপুরবেলার খাওয়া শেষ হয়েছে—ভক্তেরা সকলে প্রসাদ পেলেন। একটু বিশ্রামের পর ঠাকুর বাইরে হলঘরে বসে ভক্তদের সঙ্গে নানা কথা বলতে লাগলেন। সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় তাঁর ভাবাবেশ হোল। সকলেই সবিস্ময়ে দেখলো ঠাকুরের বালগোপাল মূর্তি—তুই হাঁটু ও এক হাত মাটীতে হামা দেওয়ার ভাবে রেখে আর এক হাত তুলে উর্ধ্বমুখে যেন কারো মুখের দিকে সাহ্লাদ সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে রয়েছেন এবং কি চাইছেন! ভাবাবেশে ঠাকুরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির ঠিক সেই রকম সংস্থান হয়ে গেল। আধবোঁজা চোখে চেয়ে আছেন।

একটু পরেই গোপালের মাকে নিয়ে গাড়ি দাঁড়াল বলরামবাবুর বাড়ির দরজায়। গোপালের মা ওপরে এসে ঠাকুরকে আপনার ইষ্টরূপে দর্শন করলেন! উপস্থিত সকলে তখন বুঝলেন গোপালের মায়ের ভক্তির জোরেই ঠাকুর সাক্ষাৎ বালগোপাল রূপ ধারণ করলেন।

একদিন।

হরিকথা প্রসঙ্গের শেষে সকল লোক চলে গিয়েছেন।

ঠাকুর দেখলেন একটি যুবক তখনো অপেক্ষা করছে।

—তুমি কেন এসেছ?

—আপনাকে দেখতে ও আপনার কথা শুনতে।

—নাম কি?

—নিত্যনিরঞ্জন ঘোষ।

—বাড়ি কোথায়?

—চব্বিশ পরগণার রাজারহাট বিষ্ণুপুরে।

ইনি পরে ঠাকুরের অন্যতম সন্তান স্বামী নিরঞ্জনানন্দ হিসেবে রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীতে খ্যাত হয়েছিলেন। এঁকেই ঠাকুর বলেছিলেন—ভগবানের কথা ভাবতে ভাবতে লোকে ভগবান হয়ে যেতে পারে। সেই কথা শুনে নিরঞ্জন বিশ্বাস বলেছিলেন, যদি হতেই হয় তবে ভগবান হওয়া ভাল।

দিন যায়।

কোলকাতা শহর হয়ে ওঠল দক্ষিণেশ্বরমুখী।

সকলের দৃষ্টি তখন ঐ দেবমানবের দিকে।

তখন থেকেই প্রতি শনিবার কোলকাতার সকল ভক্তদের বাড়িতে উৎসব আরম্ভ হোল। পরমহংসদেব এলে তাঁর সঙ্গে বহুলোক এসে সমবেত হোতেন। রামদত্ত, সুরেন মিত্র, বলরাম বসু, কোনো না কোনো ভক্তের বাড়িতে তাঁর শুভাগমন উপলক্ষে কীর্তন, ভজন হোত। পরে উপস্থিত সকলকে পরিতোষ করে আহার করানো হোত। এইভাবে ধীরে ধীরে অলক্ষ্যভাবে গড়ে উঠেছিল এক বিরাট ভক্তসঙ্ঘ।

পরমহংসদেব এইসময় তাঁর বালকভক্তদের নিজের কাছে রেখে

সাধন ভজন ও তপস্যা শিক্ষা দিতে লাগলেন। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে ভবিষ্যতের রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ। নিজের ভাবে গড়ে তুলতে লাগলেন তাঁর সৈনিক-সন্ন্যাসীদের জীবন। তাঁদের বলতেন, আগে ঈশ্বরলাভ, তারপর অন্য কাজ। এই সাধক-ভক্তদের সামনেই একদিন নরেন্দ্র সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন—নরেন যেন সহস্রদল কমল। এই নরেন্দ্রনাথকে একদিন তিনি যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তেমন শিক্ষা যুবক নরেন্দ্রনাথ জীবনে কোথাও পান নি। ঠাকুরের প্রত্যেকটি কথার মধ্যে কী গম্ভীর অর্থ থাকতে পারে তা নরেন্দ্রনাথ যেমন বুঝতেন এমন আর কেউ বুঝতে পারতেন না।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঘরের মধ্যে বসে আছেন ঠাকুর। তাঁকে ঘিরে রয়েছে ভক্তের দল। নরেন্দ্রও সেখানে উপস্থিত। ঈশ্বরীয় কথার ফাঁকে ফাঁকে চলেছে নির্দোষ রঙ্গরসের কথা। সেদিন কথা-প্রসঙ্গে উঠল বৈষ্ণবধর্মের কথা। এই মতের সারমর্ম সরল ভাষায় সকলকে বুঝিয়ে দিয়ে ঠাকুর বললেন—নামে রুচি, জীবে দয়া—। মুখের কথা শেষ হোল না। 'জীবে দয়া' পর্যন্ত বলেই তিনি সহসা সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। কতক্ষণ পরে অর্ধবাহ্যদশায় উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন– জীবে দয়া, জীবে দয়া? দূর শালা! কীটানুকীট তুই, জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।

সবাই শুনলো ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐ কথা।

গূঢ়মর্ম বুঝলেন শুধু একজন। তিনি নরেন্দ্রনাথ।

ঘরের বাইরে এসে তিনি বলেছিলেন, কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখতে পেলাম। শুষ্ক, কঠোর বেদান্তজ্ঞানকে ভক্তির সঙ্গে মিলিয়ে কি সহজ, সরল ও মধুর আলোকই প্রদর্শন করলেন।

সর্বজীবে ঈশ্বরজ্ঞান—এই শিক্ষাই সেদিন লাভ করেছিলেন ভবিষ্যতের বিবেকানন্দ তাঁর গুরুর কাছ থেকে।

১৩

গঙ্গার তীরে পাণিহাটি।

প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠমাসে এখানে বৈষ্ণবদের একটি মেলা হয়ে থাকে। আনন্দের মেলা। হরিনামের হাট-বাজার বসতো।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এই মেলার প্রবর্তন করে গিয়েছিলেন। ঠাকুর পাণিহাটির মহোৎসবে অনেকবার যোগদান করেছিলেন। কিন্তু শেষের দিকে কয়েক বছর যাবৎ (যখন থেকে ইংরেজী-শিক্ষিত ভক্তগণ দক্ষিণেশ্বরে আসতে আরম্ভ করেন) তিনি পাণিহাটি যেতে পারেন নি। এ বছর (১৮৮৫) তিনি তাঁর ভক্তগণের সঙ্গে ঐ উৎসব দর্শনে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। একদল ভক্ত ঐ কথায় বিশেষ আনন্দিত হোলেন ; কিন্তু কেউ কেউ তাঁর গলার বেদনার কথা ভেবে ঠাকুরকে ঐ বিষয়ে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন।

এই বছরের শ্রাবণ মাস থেকে ঠাকুর গলরোগে আক্রান্ত হন। এই অসুখ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্র নিজে উপস্থিত থেকে তাঁর চিকিৎসা ও সেবার ব্যবস্থা করেন। ক্রমে এই রোগের বৃদ্ধি হয়। কোলকাতা থেকে আসেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার চিকিৎসা করার জন্য। আসেন রাখাল ডাক্তার। কিছুদিন কথা বলা নিষেধ। পাণিহাটির উৎসবে যোগদান করলে যদি আবার অসুখ বেড়ে যায় সেই কথা চিন্তা করেই কয়েকজন ভক্ত ঠাকুরকে উৎসবে যেতে নিষেধ

করলেন। ঠাকুর নিষেধ শুনলেন না ; বললেন, এমন আনন্দের মেলা তোরা তো কখনো দেখিস নি ; চল্, দেখে আসবি।

—কিন্তু আপনার যে রকম অসুখ, তাতে এ বছর নাই বা গেলেন। বললেন একজন ভক্ত।

—কিছু হবে না। এখান থেকে সকাল সকাল ছুটি খেয়ে যাব, আর ছু' একঘণ্টাকাল সেখানে থেকে ফিরে আসব।

—যদি সেখানে গিয়ে ভাব-সমাধি হয় আপনার ?

—তা হোলে গলার ব্যথাটা বাড়তে পারে বটে, তখন একটু সামলে চললেই হবে।

তাঁর ঐ রকম কথায় সকল ওজর আপত্তি ভেসে গেল।

ভক্তগণ তাঁর পাণিহাটি যাওয়ার বন্দোবস্ত করতে লাগলেন।

এই তার শেষবারের মতোন পাণিহাটির উৎসবে যোগদান।

ঠাকুর বসেন ভক্তগণের সঙ্গে। সামলে চলবেন বলেছিলেন বটে কিন্তু মহোৎসবে কীর্তন শুনে তাঁর হোল ভাবাবেশ। এক পা, ছু' পা চললেন, আবার ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন। সেদিনের কথা স্মরণ করে একজন ভক্ত লিখেছেন ঃ "ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের শরীরে সেইদিন যে দিব্যোজ্জ্বল সৌন্দর্য দর্শন করিয়াছি সেইরূপ আর কখনো নয়নগোচর হইয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না। দেবদেহের সেই অপূর্ব শ্রী যথাযথ বর্ণনা করা মনুষ্যশক্তির পক্ষে অসম্ভব। ভাবাবেশে দেহের যতদূর পরিবর্তন নিমেষে উপস্থিত হইতে পারে এ কথা আমরা ইতিপূর্বে কখনো কল্পনা করি নাই। তাঁহার উন্নত বপু প্রতিদিন যেমন দেখিয়াছি তদপেক্ষা অনেক দীর্ঘ এবং স্বপ্নদৃষ্ট শরীরের ন্যায় লঘু বলিয়া প্রতীত হইতেছিল, শ্যামবর্ণ উজ্জ্বল হইয়া গৌরবর্ণে পরিণত হইয়াছিল ; ভাবপ্রদীপ্ত মুখমণ্ডল অপূর্ব জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া চতুঃপার্শ্বে আলোকিত করিয়াছিল ; এবং মহিমা করুণা শান্তি ও আনন্দপূর্ণ মুখের সেই অনুপম হাসি দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়

জনসাধারণকে কিছুক্ষণের জন্য সকল কথা ভুলাইয়া তাঁহার পদানুসরণ করাইয়াছিল। উজ্জ্বল গৈরিকবর্ণের পরিধেয় গরদখানি ঐ অপূর্ব অঙ্গকান্তির সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্যে মিলিত হইয়া তাঁহাকে অগ্নিশিখা-পরিব্যাপ্ত বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছিল।”

দিব্য প্রকাশ হওয়ার পর থেকে ঠাকুরের লোকাত্তর ভাব এবং অমৃতবাণীর কথা লোকের মুখে-মুখে প্রচারিত হওয়ায় নানা স্থান থেকে নানা শ্রেণীর লোক দক্ষিণেশ্বরে আসতে থাকে। তার ওপর একে একে উপস্থিত হয়েছেন তাঁর চিহ্নিত সন্তানের দল। এদের সকলের সঙ্গে এক যুগ ধরে একাদিক্রমে একইভাবে কথা বলতে হয়েছে ঠাকুরকে। গলার অসুখটা প্রধানত এই কারণেই হয়েছিল। একদা যিনি কথা বলার জন্য মানুষ খুঁজে অস্থির হয়েছিলেন—যেজন্য মায়ের কাছে আবদার করেছিলেন—এখন তিনিই যেন অতিষ্ঠ হয়ে সেই জগন্মাতাকেই অভিমানের সুরে বলতে লাগলেন, মা, এত লোক কি আনতে হয়? একেবারে ভীড় লাগিয়ে দিয়েছিস।

দিন যায়।

জনতার চাপে বিব্রত হয়ে ওঠেন রামকৃষ্ণ।

গলায় বেদনা অনুভব করার পরও, ঠাকুর অসুস্থ জেনেও দক্ষিণেশ্বরে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের ভীড় সমানভাবে চলতে থাকে। কখনো কখনো এই সময়ে বিব্রত দেবমানব নিজের শরীরটাকে দেখিয়ে জগন্মাতাকে বলতেন, একটা তো এই ফুটো ঢাক, রাতদিন এটাকে বাজালে আর কয়দিন টিকবে?

বেশি দিন যে আর টিকবে না, পরমপুরুষ তা বুঝতে পেরেছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ, গিরিশ ঘোষ, মহেন্দ্র মাস্টার এদের তিনি মাঝে মাঝে বলতেন, তোমরা এদের সঙ্গে কথা বলো, আমি একটু নিষ্কৃতি পাই। কিন্তু নিষ্কৃতি কে দেবে তাঁকে? তিনি যে এসেছেন

"যতমত তত পথ" এই মহান বাণী প্রচার করতে ; তাঁর মুখের কথা না শুনলে কারো কি তৃপ্তি হয় ? কথা বলতেই হয় তাঁকে আর এখনকার অবস্থায় কথা বলা মানেই রোগের বৃদ্ধি। বিশ্রাম নেই, ভাবমুখে কথারও শেষ নেই। এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন ঠাকুর বললেন, যেদিন এই দেহটাকে অনেক লোকে দেবজ্ঞানে ভক্তিপূজা করবে, তখনই এর অন্তর্ধান হবে।

উৎকণ্ঠিত হন সকলে।

গলদেশে ক্ষত হয়েছে, বললেন চিকিসৎকগণ।

ঠাকুরের সম্বন্ধে ধরকাট আরম্ভ করলেন ভক্তগণ। কিন্তু সে কথা শোনে কে ? সকলেই তাঁকে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন চিকিৎসকদের নির্দেশ মেনে চলার জন্য। একদিন গিরিশচন্দ্র ঠাকুরকে দেখতে এসে বললেন, যা হওয়ার হয়ে গেছে, এখন কিছুদিন একটু সাবধানে থাকুন, তাহোলেই সেরে উঠবেন।

—ডাক্তারদের সব কথা মেনে কি থাকা যায় ? এই ছাখ্ দেখি, তুই বাগবাজার থেকে আমাকে দেখতে এলি, আর আমি তোর সঙ্গে একটিও কথা কইব না, তা কি হয় ?

– আপনাকে দেখলেই আনন্দ হয়, কথা নাই বা কইলেন।

—তোদের যে কষ্ট হবে আমার মুখ থেকে একটি কথা না শুনলে।

—আমাদের কোন কষ্ট হবে না—ভাল হোন, আবার কত কথা শুনব।

কিন্তু সে কথা শোনে কে ?

ডাক্তারের নিষেধ, নিজের কষ্ট—সব কিছু ভুলে গিয়ে তিনি আগের মতোন ভক্তদের সঙ্গে প্রতিদিন আলাপ করতে থাকেন। বিরামহীন, বিশ্রামহীন সেই ঈশ্বরপ্রসঙ্গ। তারপর পাণিহাটির মহোৎসবে যোগদান করে ঠাকুরের গলার বেদনা বেড়ে গেল। সেদিন আবার ফিরবার পথে বৃষ্টিতে ভিজতে হয়েছিল। গলায় প্রলেপ

লাগিয়ে ঘরের মধ্যে ছোট তক্তপোষখানির ওপর চুপ করে ঠাকুর বসে আছেন। এমন সময়ে এলেন একজন ভক্ত। প্রণাম করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে ?

—এই দ্যাখ্‌না, ব্যথা বেড়েছে, ডাক্তার বেশি কথা বলতে নিষেধ করেছে।

—সেদিন আপনি পেনেটি গিয়েছিলেন, আমার বোধহয় সেইজন্য ব্যথাটা বেড়েছে।

—ডাক্তার যদি ভাল করে বারণ করতো তা'হোলে আমি কি সেখানে যাই ?

—যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। এখন একটু সাবধানে থাকুন, তা'হোলেই সেরে যাবে।

ঠাকুর খুশি হোলেন। তবু বললেন—তা বলে একেবারে কথা বন্ধ করে কি থাকা যায় ?

ক্রমে আষাঢ় মাস অতীত হোল।

বেদনার উপশম হয় না।

কোন কঠিন খাদ্য আর গলা দিয়ে নামে না। দুধ, ভাত ও সুজির পায়স মাত্র খেয়ে ঠাকুরকে দিন কাটাতে হয়। ১৮৭৫ সনে সিদ্ধিলাভের পর থেকে বিগত দশ-এগার বছরকাল হাজার হাজার ধর্মপিপাসু ব্যক্তির কাছে চলেছে বিরামহীন অমৃতবর্ষণ ; লোককে তিনি বিলিয়েছেন সুধা আর নিজে কণ্ঠে ধারণ করেছেন গরল। নীলকণ্ঠ সাধক আজ তাই রোগ-জর্জর শরীরেও বলছেন, কথা না বলে কি থাকতে পারি ? মানব-কল্যাণে কী অপরিসীম করুণা !

সংসারের শোকেতাপে মুহ্যমান লোকেরা আসে তাঁর কাছে—আসে তারা পথের সন্ধান আর শান্তির প্রয়াসী হয়ে। করুণায় আত্মহারা হন রামকৃষ্ণ – ভুলে যান চিকিৎসকের নিষেধ। শুরু হয় উপদেশ-অমৃতবর্ষণ। কৃতার্থ হয় তারা—কিন্তু অবসন্ন হয়ে পড়েন

তিনি। বেদনা বাড়ে, রোগের আর উপশম হয় না। মানবপ্রেম আর ঈশ্বরপ্রেম তাঁকে কিছুতেই নির্বাক থাকতে দেয় না।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। ১৮৮৫।

ভক্তগণ ঠাকুরকে কোলকাতায় চিকিৎসার জন্য নিয়ে এলেন। দক্ষিণেশ্বরে আনন্দের হাট উঠে গেল। বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে কিছুদিন থাকার পর শ্যামপুকুর স্ট্রীটে একখানি পরিচ্ছন্ন বাড়িতে ঠাকুরকে রাখা হোল। ঠিক হোল কবিরাজী চিকিৎসা হবে। এলেন গঙ্গাদাস কবিরাজ। তাতে কিন্তু রোগের উপশম হোল না! তখন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ঠাকুরের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করলেন।

একদিন মহেন্দ্র ডাক্তার এসে পরমহংসদেবকে পরীক্ষা করতে করতে বললেন, এসব আপনারই খেলা বলে মনে হচ্ছে।

—আমার নয় গো, এসব তাঁরই ইচ্ছায়।

মহেন্দ্র ডাক্তার বিজ্ঞানী। ঈশ্বর মানেন না। হঠাৎ ডাক্তারকে লক্ষ্য করে ঠাকুর বললেন—কি জানি বাপু, তোমার কি মত! তবে তোমাদের মতোন যারা বিজ্ঞান নিয়ে মত্ত, শুনেছি—তাদের নাকি দুটো দল আছে; একদল ঈশ্বরকে একেবারে উড়িয়ে দিতে চায়। আর একদল যদিও ঈশ্বরকে মানে, কিন্তু ঈশ্বরকে তারা যেমন করে মনে মনে ঠাওরে রেখেছে, ঈশ্বর তাদের সেই মনগড়া রকম ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এইটাই জোর করে জানায়, যেন ঈশ্বর সম্বন্ধে জানা-শোনা তাদের সব হয়ে গেছে।

—কথাটা সত্য। তবে ওটা হচ্ছে বিদ্যার গরম বা বদ্‌হজম।

—ঠিক বলেছ। বেশি পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কার আসে। একেই বলে বিদ্যার অভিমান।

—আমার কি মনে হয়, জানেন—যা-কিছু শিখেছি, জেনেছি বা বুঝেছি, সে সব যৎসামান্য। শিখবার জানবার এখনো কত কি রয়েছে।

সেইজন্য কারো কাছ থেকে কিছু শিখতে আমার লজ্জা বা অপমান বোধ হয় না। আপনার এইসব ভক্তদের কাছেও আমার শিখবার মতোন অনেক কিছু থাকতে পারে।

কোলকাতায় এসে ঠাকুরের শরীরের অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হোল না। কিন্তু মনের আনন্দ ও প্রসন্নতা কিছুমাত্র হ্রাস পেল না; বরং আরো বেশিমাত্রায় ভক্তদের উল্লসিত করলো। শ্যামপুকুরের বাড়িতে সারদাদেবীকেও আনা হয়েছে। তিনি নইলে ঠাকুরের পথ্যের দেখাশুনা করবে কে? এক মহল বাড়ি; বাড়িতে অপরিচিত পুরুষদের অবিরাম যাওয়া-আসা, তাঁর একার কত না অসুবিধা। তবু সব অসুবিধা তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়; স্বামীর পরিচর্যায় তিনি একাগ্রচিত্ত হয়ে ওঠেন। ঠাকুরকে রোগমুক্ত করার আশায় বুক বেঁধে তিনি দিনের পর দিন একভাবে কাটিয়ে দিতেন। এমন নীরবে নিঃশব্দে অবস্থান করতেন যে, যারা প্রত্যহ এখানে আসা-যাওয়া করতো তাদের অনেকেই জানতে পারতো না যে, সারদাদেবী ঠাকুরের সেবাকার্যের ভার নিয়ে এখানে রয়েছেন।

সেবা করার ভার নিয়েছেন স্বয়ং নরেন্দ্রনাথ।

তিনি এখন রাত্রিবেলায় এখানে অবস্থান করেন।

তাঁর দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে গোপাল, কালী, শশী প্রভৃতি বালক-শিষ্যগণ শ্রীগুরুর সেবায় নিজেদের আত্মসমর্পণ করেছেন। বাড়ি ছেড়ে তারা সকলেই এখন এখানে থাকেন। ঠাকুরের অসাধারণ অলৌকিকত্ব তাঁদের প্রাণে যে দিব্য আশা, আলোক, আনন্দ ও শান্তির ধারা প্রবাহিত করেছিল, কেবলমাত্র তারই প্রেরণায় তাঁরা ভবিষ্যতের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করে ঐ কাজে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন।

কার্তিক মাস।

কালীপূজোর দিন এগিয়ে আসছে।

ঠাকুরের শরীরের অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি দেখা গেল না। প্রথম প্রথম চিকিৎসায় একটু ফল পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু সেটা স্থায়ী হোল না। বরং সকলের মনে এখন আশঙ্কা জাগল যে ব্যাধি প্রবল আকার ধারণ করতে পারে। শ্যামপুকুরের বাড়িতে কালীপূজো হয়, এমন ইচ্ছা প্রকাশ করলেন ঠাকুর। ভক্তদের মধ্যেও কারো কারো ইচ্ছা যে এখানে প্রতিমা এনে পূজো করা হয়। কিন্তু পূজোর হাঙ্গামায় পাছে ঠাকুরের শরীর আরও অবসন্ন হয়ে পড়ে সেইজন্য তাঁরা এই প্রস্তাব বর্জন করলেন।

পূজোর আগের দিন। রাত্রিবেলায় রামকৃষ্ণ নিজেই বলে বসলেন, কাল রাতে কালীপূজো করতে হবে। সব যোগাড় করে রাখিস।

ঠাকুরের নির্দেশ অমান্য করা সহজ কথা নয়।

ভক্তগণ পূজোর আয়োজনে প্রবৃত্ত হোলেন।

ঠাকুরের ঘরেই খানিকটা স্থান মার্জনা করে পূজোর উপকরণ সাজিয়ে রাখা হোল। পূজো ষোড়শোপচারে হবে কি পঞ্চোপচারে হবে, অন্নভোগ দেওয়া হবে কি না, পূজকের পদ কে গ্রহণ করবে—এসব বিষয়ের কোনো মীমাংসা করতে না পেরে অবশেষে স্থির হোল, গন্ধপুষ্প, ধূপদীপ, ফলমূল এবং মিষ্টান্নমাত্র সংগ্রহ করে রাখা হোক ; পরে ঠাকুর যেমন বলেন, তেমন করা যাবে।

সন্ধ্যাবেলা।

নিত্যসঙ্গী ভক্তগণ ছাড়াও, বাইরের ভক্তরাও একে একে উপস্থিত হোলেন। ঠাকুরের ঘরে বৃত্তাকারে সবাই বসে আছেন। জন ত্রিশ লোক হবে। সকলের দৃষ্টি ধ্যানমগ্ন রামকৃষ্ণের দিকে নিবদ্ধ। থরে থরে পূজার উপকরণ সজ্জিত। সকলেই ভাবছেন ধ্যান ভাঙলেই ঠাকুর পূজায় বসবেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, ঠাকুরের ধ্যানভঙ্গের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। ভক্তরা উদ্বিগ্ন হোলেন।

উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে ঠাকুরের 'ভৈরব' শিষ্য, নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ উপলব্ধি করলেন, ঠাকুর যে ধ্যানে ডুবে আছেন, এর নিশ্চয়ই কোনো অর্থ আছে, উদ্দেশ্য আছে। নইলে এভাবে স্থাণুর মতোন স্থির হয়ে তিনি বসে থাকতেন না। কিসের এই সংকেত? হঠাৎ গিরিশের যেন মনে হোল, নিজের শরীররূপ জীবন্ত প্রতিমায় জগদম্বার পূজার জন্য ভক্তদের তিনি এইভাবে নীরবে সংকেত করছেন। নিশ্চয়ই তাই। বীরভক্ত গিরিশ, ভক্তিসাধক গিরিশ অমনি সবেগে উঠে দাঁড়ালেন।

(পুষ্পপাত্র থেকে দু'হাতে চন্দনচর্চিত পুষ্প, বিল্বপত্র, দুর্বাদল তুলে নিয়ে 'জয় মা' মন্ত্রে ঠাকুরের পাদপদ্মে অঞ্জলি দিতে লাগলেন। উপস্থিত সকলে গিরিশের এই কাণ্ড দেখে স্তব্ধ, অভিভূত হোলেন। হোলেন বিমোহিত। পরমূহূর্তেই তাঁরা প্রত্যক্ষ করলেন—ঠাকুরের ধ্যানভঙ্গ হয়েছে; তাঁর মুখখানি জ্যোতির্ময় আর অপরূপ এক হাসির আলোকে উদ্ভাসিত। হাত দুটি বরাভয় দেওয়ার ভঙ্গিতে লীলায়িত। সকলেরই মনে হোল—ঠাকুরের পবিত্র দেহকে আশ্রয় করে তাদের সামনে আবির্ভূতা হয়েছেন দিব্য জ্যোতির্ময়ী দেবী প্রতিমা!

মানবদেহ মিলিয়ে গেছে শূন্যে।

সেখানে জ্বল্ জ্বল্ করছে শত বিদ্যুতের প্রভা নিয়ে দিব্য প্রভাময়ী কালীমূর্তি। সেই মূর্তির পদযুগলে বারংবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করছেন গিরিশ। তখন ভক্তগণ সকলেই গিরিশের মতোন পুষ্পপাত্র থেকে ফুল-চন্দন নিয়ে 'জয় মা'-রবে অঞ্জলি দিতে আরম্ভ করলেন। তাঁদের সেই জয়ধ্বনি পরিপূর্ণ করে তুললো গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতাকে। মুখরিত হয়ে উঠল সারা পল্লী।) পূজা শেষ হোল। ভক্তগণ স্বহস্তে নিবেদন করলেন ঠাকুরকে ফল ও মিষ্টান্ন। তিনি গ্রহণ করলেন প্রসন্ন মনে। তাঁর ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করে সবাই হোলেন ধন্য।

একদিন বিকেলবেলায় অসুস্থ ঠাকুরকে দেখতে এসেছেন মহেন্দ্র

ডাক্তার। নরেন্দ্রনাথ সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন। এর আগে নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে ভজন শুনে তিনি খুব প্রীত হয়েছিলেন। আজ নরেন্দ্রনাথ ডাক্তারকে দু'তিন ঘণ্টা ধরে ভজন শোনালেন। ডাক্তার এত খুশি হোলেন যে, বিদায় গ্রহণের পূর্বে নরেন্দ্রকে পুত্রের ন্যায় স্নেহে আশীর্বাদ ও আলিঙ্গন করে বললেন, এর মতোন ছেলে ধর্ম-লাভ করতে এসেছে দেখে আমি বিশেষ আনন্দিত। এ একটি রত্ন, যাতে হাত দেবে সেই বিষয়েরই উন্নতি সাধন করবে।

ঠাকুর চাইলেন প্রসন্নদৃষ্টিতে নরেন্দ্রনাথের প্রতি।

বললেন, কথায় বলে অদ্বৈতের হুঙ্কারেই গৌর নদীয়ায় এসেছিলেন, সেইরূপ ওর জন্যই তো সব গো!

দিন যায়।

ঠাকুরের অসুখ কোনোদিন বেশি, কোনোদিন একটু কম, এইভাবে চলতে থাকে। ডাক্তার একদিন এসে রোগ বেড়েছে দেখে বলে বসলেন, নিশ্চয় পথ্যের কোনো অনিয়ম হয়েছে।

—সে কি কথা? অনিয়ম কেন হবে?

—আচ্ছা, আজ কি কি খেয়েছেন?

—সকালে ভাতের মণ্ড, ঝোল ও দুধ; সন্ধ্যায় দুধ ও যবের মণ্ড, এই তো খাই।

– তবু নিশ্চয়ই নিয়মের কোনো গোলমাল হয়েছে। আচ্ছা, বলুন তো কি কি আনাজ দিয়ে ঝোল রাঁধা হয়েছিল।

—আলু, কাঁচকলা, বেগুন, দুই এক টুকরো ফুলকপিও ছিল।

—ফুলকপি খেয়েছেন? এইতো খাওয়ার অনিয়ম হয়েছে। ফুলকপি বিষম গরম ও দুষ্পাচ্য। কয় টুকরো খেয়েছেন?

—এক টুকরোও খাইনি, তবে ঝোলের মধ্যে ছিল দেখেছি।

—খান আর নাই খান, ঝোলের মধ্যে ছিল তাই হজমের গোলমাল হয়ে আজ ব্যামোটা বেড়েছে।

—সে কি গো। কপি খেলাম না, পেটের অসুখ হয়নি। ঝোলে কপির একটু রস ছিল বলে ব্যামো বেড়েছে—এ দেখছি তেঁতুলতলা দিয়ে গেল বলে সর্দি হোল—সেই রকম।

সকলে হাসতে লাগলেন ঠাকুরের রহস্যময় এই কথা শুনে।

(শ্যামপুকুরের বাসা-বাড়িতে ঠাকুর একদিন দেখলেন—তাঁর শরীরের ভেতর থেকে একটা সূক্ষ্মদেহ বের হয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর তার ঘাড় ও গলার সন্ধিস্থলে অনেকগুলো ঘা হয়েছে।

ঠাকুর শিউরে উঠলেন।

—মা, আমার গলায় এ-রকম ঘা কেন দিলি?

সঙ্গে সঙ্গে এ কথার উত্তর পেলেন ঠাকুর। মা যেন বলছেন, কেন গলায় ঘা হোল বুঝতে পারছিস না? কত রকমের অন্যায় কাজ করে কত পাপী তোকে ধরেছে, তোকে ছুঁয়েছে। তারা শুদ্ধ হয়েছে, পাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু তাদের সেইসব পাপ তোর শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ দেহে প্রবেশ করে ঐ ভাবে ঘায়ের সৃষ্টি করেছে। তুই যেন তোর পুণ্যের জোরে অন্যের পাপ দূর করে দিলি, কিন্তু সে পাপ যাবে কোথায় বল্? এখন তোর ঘাড়ে এসে চেপেছে—এসব তারই ফল।)

এতদিনে ঠাকুর বুঝলেন তাঁর ব্যাধির আসল রহস্য।

সত্যিই তো, এজন্য মায়ের ওপর তো আর তাঁর অভিমান করা চলে না। পাপের ভোগ তো আছেই—একজনকে তার ভার ঘাড়ে নিতেই হবে।

(পরের দিন ভক্তদের বললেন এই কথা ঠাকুর।

তাঁরা সবাই যারপর নাই ক্ষুব্ধ হোলেন।

ঠিক হোল বাইরের কোন দর্শনার্থী যাতে ঠাকুরকে ছুঁতে না পারে, সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে।)

(ভক্ত-ভৈরব গিরিশ বললেন, চেষ্টা করতে হয়, করো ; কিন্তু ওটা বন্ধ করা সম্ভব হবে না।

—কেন হবে না শুনি। জিজ্ঞাসা করলেন নরেন্দ্রনাথ।

—ঐ জন্যেই যে উনি দেহ ধারণ করেছেন। পাপীর পাপমোচন করার জন্যেই উনি পতিতপাবন হয়ে এসেছেন।)

আসল কথা তাই।

শ্যামপুকুরের বাড়িটি এখন দিব্য দেবমন্দিরে পরিণত হয়েছে। পরমহংসদেবের রোগটি যেন একটি গৌণ ব্যাপার—ছলনা মাত্র। আসল কথা হোল ঈশ্বরের কথা আর সঙ্ঘগঠন। দলের পর দল লোক আসে। তারা ফিরে যায় তৃপ্ত হয়ে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অমৃতরস পান করে। সে অমৃত পরিবেশন করেন পরমপুরুষ বিরামহীন ভাবে। তাই রোগ যেমন তেমনই রয়ে গেল। মহেন্দ্র ডাক্তার একদিন পরামর্শ দিলেন, কোলকাতার বাইরে কোথাও খোলা যায়গায় ঠাকুরকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন।

তাই হোল।

শ্যামপুকুরের বাসায় শীতের মুখে রোগ খুব বেড়ে গেল। অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি ঠাকুরকে কাশীপুরে গঙ্গাতীরে একখানি বাগান-বাড়িতে নিয়ে আসা হোল। গোপালচন্দ্র ঘোষের এই বিরাট বাড়িখানা মাত্র আশী টাকায় ভাড়া পাওয়া গেল। ভাড়ার দায়িত্ব নিলেন ভক্ত সুরেন মিত্র। ১৮৮৫, ২৫শে ডিসেম্বর রামকৃষ্ণ এলেন কাশীপুরে। তাঁর সেবা করার জন্য সঙ্গে এলেন সারদাদেবী, গোলাপ মা, লাটু, নিরঞ্জন, কাশীপ্রসাদ আর নরেন্দ্রনাথ।

দোতলা বাড়ি। বাড়ির সামনেই বাগান। ওপরের গোল ঘরটিতে ঠাকুরের শয়নের ব্যবস্থা হোল। দক্ষিণদিকের গাড়ি-বারান্দার ছাদে দাঁড়িয়ে তিনি বাগানের শোভা দেখতেন। বাগান ও বাগানের নীচে গঙ্গা দেখে ঠাকুরের কী আনন্দ। নীচের তলায়

তিনটি ঘর। দক্ষিণদিকের ঘরে ভক্তরা থাকেন। মাঝের ঘরে থাকেন সারদাদেবী ও গোলাপ মা। উত্তরদিকের ঘরটি রান্নাঘর হিসেবে ব্যবহৃত হোত। বাগানের পূর্বদিকে একটি পুকুর। পুকুরে শান-বাঁধানো ঘাট। ভক্তরা কখনো কখনো এই বাঁধাঘাটে বসে নিজেদের মধ্যে ঠাকুরের কথা আলোচনা করতেন। রাত্রে দু'চারজন ভক্ত নিঃশব্দে তাঁর কাছে বসে থাকতেন, কেউ দাঁড়িয়ে পাখার বাতাস করতেন।

আটমাস কাল ঠাকুর বাস করেছিলেন কাশীপুরের এই রমণীয় উদ্যানবাটীতে। "ঐ আটমাসকাল ব্যাধি যেমন প্রতিনিয়ত প্রবৃদ্ধ হইয়া, তাঁহার দীর্ঘ বলিষ্ঠ শরীরকে জীর্ণ ভগ্ন করিয়া শুষ্ক কঙ্কালে পরিণত করিয়াছিল, তাঁহার সংযমসিদ্ধ মনও তেমনি উহার প্রকোপ ও যন্ত্রণা এককালে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি ব্যক্তিগত ও মণ্ডলীগতভাবে ভক্ত-সংঘের মধ্যে যে কার্য ইতিপূর্বে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার পরিসমাপ্তির জন্য নিরন্তর নিযুক্ত থাকিয়া প্রয়োজনমত তাহাদিগকে শিক্ষাদীক্ষাদি-প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।"

রোশশয্যায় শায়িত রামকৃষ্ণের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল একজনের ওপর। তিনি নরেন্দ্রনাথ। এই কাশীপুরের বাগান বাড়িতেই একদিন নিভৃতে ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, মা তোকে তাঁর কাজ করাবার জন্য সংসারে টেনে এনেছেন, তুই যাবি কোথায়? আর একদিন বলেছিলেন, এইসব ছেলেদের ভার তোর ওপর দিয়ে যাব; আমি যখন থাকব না, তখন তুই এদের চালাবি।

রামকৃষ্ণ-লীলার শেষ অধ্যায় কাশীপুর।

এইখানেই তিনি, নরেন্দ্রনাথের জীবন গঠন করেন নিজের হাতে।

একদিন। ঠাকুর নিজেকে আজ খুব সুস্থ মনে করছেন। নীচে নেমে বাগানে বেড়াতে গেলেন। বাগানে বেড়াতে বেড়াতে ঠাণ্ডা লেগে গলার ব্যথা বেড়ে গেল। খুব দুর্বল হয়ে পড়লেন তিনি। ডাক্তার তাঁকে কচি পাঁঠার ঝোল খেতে বললেন। মাংস সংগ্রহ

করতে ভক্তরা ছুটলো। ঠাকুর বলে দিলেন, যে দোকানে মা কালীর মূর্তি আছে, সেখান থেকে মাংস আনবি। মাংস আনা হোল। সারদাদেবী নিজের হাতে যত্নের সঙ্গে ঝোল তৈরি করলেন।

পৌষের শীতের রাত্রি।

চারদিক নীরবতায় ঝিম ঝিম করছে।

ওপরে অনন্ত আকাশ যেন সহস্র নক্ষত্রের চোখ দিয়ে পৃথিবীকে দেখছে। নরেন্দ্রনাথ বাগানে পায়চারি করছেন। সঙ্গে আছেন কয়েকজন সতীর্থ। তাদের তিনি বললেন, আমার মন বলছে, ঠাকুরের যে ভীষণ ব্যাধি, তিনি দেহরক্ষার সংকল্প করেছেন। সময় থাকতে তোরা তাঁর সেবা ও ধ্যান-ভজন করে যে যতটা পারিস আধ্যাত্মিক উন্নতি করে নে।

পৌষমাস শেষ হয়ে গেল।

এলো ইংরেজী নতুন বছর। ১৮৮৬।

ঠাকুরের ইহজীবনের শেষ বৎসর।

১লা জানুয়ারি। অফিসের ছুটি। গিরিশ প্রমুখ ভক্তরা এসেছেন। আজ শরীর একটু সুস্থ মনে করে রামকৃষ্ণ বিকেলবেলায় বাগানে বেড়াবার জন্য দোতলা থেকে নামলেন। পরনে লালপেড়ে কাপড়, গায়ে সবুজরঙের বনাতের জামা, মাথার টুপিও সবুজরঙের বনাতের, কান পর্যন্ত ঢেকেছে। পায়ে মোজা এবং লতাপাতা আঁকা চটীজুতো। শুধু খোলা মুখখানাই দেখা যাচ্ছে। সঙ্গে আছেন গিরিশ ও আরো দু'চারজন ভক্ত। হঠাৎ গিরিশের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, আমাকে তোমার কি মনে হয়?

নতজানু হয়ে গিরিশ বললেন, শুকদেব, ব্যাস, বাল্মিকী যাঁর মহিমা বর্ণনা করতে অপারগ আমি তাঁর কথা কি বলব?

গিরিশের কথা শুনে ঠাকুরের সমাধির অবস্থা দেখা দিলো।

ভাবমুখে বললেন, তোমাদের কি আর বলব, আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হোক।

অসুখ একটু সারবার উপক্রম হয়েছিল, তারপর থেকে উপশমের আর কোনো চিহ্ন দেখা গেল না। ডাক্তারগণের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে অসুখ আপন গতি অনুসরণ করতে লাগল। মুখে লালা জমতে তখন চিকিৎসার ধারা বদলানো হোল। এলেন রাজেন কবিরাজ। তিনি ওষুধ দিয়ে গুগ্‌লির ঝোল পথ্য দেওয়ার জন্য বলে গেলেন। কালিপ্রসাদ কাশীপুর বাগানের পুকুর থেকে গুগ্‌লি তুলে খোসা ভেঙে দিতেন আর সারদাদেবী তাই দিয়ে ঝোল করে পরমহংসদেবকে আহার করতে দিতেন।

ক্রমে শীত কেটে গেল।

গ্রীষ্ম গেল।

বর্ষাও যায় যায়।

শ্রাবণ মাসে ঠাকুরের রোগ খুব বেড়ে গেল।

রোজ গলা দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে।

দেহ নির্জীব। উঠবার সামর্থ্য নেই। সেদিন সকালে অবিরাম রক্ত পড়ছে। নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখের সামনে পাত্র ধরে রয়েছেন। এমন সময় ঠাকুর হাঁপাতে হাঁপাতে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, জীব, আমি যে তোর জন্যে পাত্র-পাত্র রক্ত ঢাললাম, তুই আমার কি করলি?

ঠিক সেইসময়ে পাত্র হস্তে উপবিষ্ট নরেন্দ্রনাথের মনের মধ্যে জেগেছে এক তীব্র সংশয়ঃ একবার নিজের মুখে বলে যাও যে তুমি অবতার, তা'হোলে মানব, নইলে মানব না।

অমনি ভাবগ্রাহী অন্তর্যামী পরমপুরুষ রক্তবমি করতে করতে মুমূর্ষু পাণ্ডুর মুখখানি তুলে আয়ত চোখ দুটি নরেন্দ্রের দিকে মেলে ধরে বলে উঠলেন, এখনো তোর সন্দেহ? যে রাম, যে কৃষ্ণ, ইদানীং এই দেহে সেই-ই রামকৃষ্ণ।

সকল সংশয়ের অবসান হোল আজ নরেন্দ্রনাথের।

—ওরে পাঁজিখানা পড়্ তো শুনি।

শ্রাবণের শেষাশেষি একদিন শয্যাশায়ী অবস্থায় এই কথা বললেন ঠাকুর। ভক্তদের মধ্যে যোগীন্দ্রনাথ পাঁজি পড়তে লাগলেন। সেদিন থেকে পর-পর কয়টা দিনের বিবরণ পড়ে ৩১শে শ্রাবণের সংক্রান্তির দিনটিও পড়া হোল, ঠাকুরও পাশ ফিরে শুলেন। যোগীন্দ্র পাঁজি বন্ধ করলেন। ঠাকুর আর শুনতে চাইলেন না। এইসময়ে একদিন নিভৃতে নরেন্দ্রনাথকে ডেকে ঠাকুর বললেন ঃ আয়, কাছে একটু বোস্। তারপর মানসপুত্রের হাতখানি নিজের হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে তিনি বললেন—আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতে অনেক কাজ করবি।

এলো শ্রাবণ-সংক্রান্তি।

সেদিন রবিবার।

ভক্তগণের সমাগমে বাগান ভরে গিয়েছে।

ঠাকুরকে আজ বড় চঞ্চল মনে হচ্ছে।

শরীরেও অসহ্য জ্বালা—এত জ্বালা আগে কখনো বোধ করেন নি। ডাক্তার নবীন পালকে ডেকে আনা হোল। ঠাকুর ডাক্তারকে দেখে বললেন, আজ আমার গা ভারি জ্বলছে, কে যেন শিরায় শিরায় ফুটন্ত গরম জলের পিচকারী দিচ্ছে। কেন বলো তো ?

ডাক্তার কিছুই বুঝতে পারলেন না।

তিনি নীরব নতমুখ।

সারাদিন কাটলো একই ভাবে।

কিছুই আহার করলেন না।

বললেন, আহারে রুচি নেই। শুয়ে আছেন, ভক্তরা পাখা নিয়ে

বাতাস করছেন। একটু তন্দ্রার মতো হোল। রাত তখন দেড়টা। হঠাৎ বলে উঠলেন, আমার ভীষণ ক্ষিধে পাচ্ছে। আমায় কিছু খেতে দাও।

সুজি তৈরি করাই ছিল। ভক্তরা ধরলেন সেই পাত্র তাঁর মুখের কাছে। বিছানায় বসে সমস্ত সুজি তিনি পেটপুরে আহার করলেন। আহার করে একটু শান্তি বোধ করতে লাগলেন। তখন কে জানত যে, ইহসংসারে ঠাকুরের এই শেষ খাওয়া। আহারের কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর সহসা বলে উঠলেন—ছাখ্, আমার হাঁড়ি-হাঁড়ি খিচুড়ী খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

তখন ভক্তগণের মধ্যে কেউ-ই বুঝতে পারেন নি যে, নিজমুখেই ঠাকুর তাঁরই মহোৎসবের নির্দেশ দিয়ে গেলেন।

ঠাকুর নীরবে শুয়ে আছেন।

তাঁর দিকে তাকিয়ে নীচে বসে আছেন ভক্তগণ।

ঘর নিস্তব্ধ। বাইরেও তেমনি নিস্তবতা বিরাজ করছে। স্তিমিত নয়ন। কোথায় কাশীপুর আর কোথায় দক্ষিণেশ্বর। সেই জাগ্রতদেবী ভবতারিণী কি আজ তাঁর প্রিয়তম সন্তানের শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছেন? মায়ের সন্তান আজ কি মায়ের ধ্যানে ডুবে গেলেন? সহসা কণ্ঠের নিস্তব্ধতা ভেঙে যায়। উদাত্ত আকুল কণ্ঠে ঠাকুর বলে ওঠেন—কালী! কালী! কালী! রোগে জীর্ণ-ক্ষীণ কথা নয়, এ সেই আগের উদাত্ত কণ্ঠ—এমন স্বর ভক্তগণ ঠাকুরের কণ্ঠে অনেকদিন শোনেন নি।

কালী! কালী! কালী!

সকলে সবিস্ময়ে দেখলো যে, রোগপাণ্ডুর মুখখানি দিব্য দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে; দীর্ঘায়ত চোখ দুটিতে ঝরছে প্রেমের ধারা—দৃষ্টি নাসাগ্রে নিবদ্ধ। সর্বাঙ্গ নিস্পন্দ।

মহাসমাধিতে নিমগ্ন হোলেন পরমপুরুষ।

সেদিন ছিল কৃষ্ণা প্রতিপদ। চাঁদের বিমল কিরণে সমস্ত পৃথিবী

উদ্ভাসিত। ক্রমে চন্দ্রমণ্ডলের চারিদিকে একটা জ্যোতির রেখা দেখা দিল। সমাধি আর ভাঙল না। রাত তিনটা, চারটা শেষ হয়ে সকাল হোল। সারদাদেবীকে খবর দেওয়া হোল। ঘরে ঢুকেই স্বামীর নিস্পন্দ দেহের প্রতি তাকিয়ে সাধ্বী কেঁদে উঠলেন।

—মা, তুই কোথায় গেলি গো!

শুধু এই কয়টি কথা বলে তিনি নীরব হোলেন। বসলেন স্বামীর পদতলে। বসেই তিনি ধ্যানে ডুবে গেলেন। সে মুখে তখন বিন্দুমাত্র শোকের চিহ্ন নেই।

দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মুখখানি তখন যেন বিষণ্ণ ভাব ধারণ করেছে। বারো বছরের সাধনাপূত পীঠস্থান আজ যেন শূন্য মনে হোল। আকাশে চাঁদ, অজস্র নক্ষত্র শোভা পাচ্ছে—শুধু পৃথিবী আজ অন্ধকার। অন্ধকার নেমে এলো ভক্তদের মনে।

শতাব্দীর পটে এক অপার্থিব লীলার আজ অবসান হোল। মানব-কল্যাণ সাধনের জন্যই তো সেই বিশ্ববরেণ্য সাধকের অলৌকিক সাধনা। কাশীপুরের মহাশ্মশানে যে দেবদেহ সেদিন ভস্মীভূত হোল—সেই দেহধারী যিনি ছিলেন তিনি আজ নেই। কিন্তু আছে তাঁর লীলার মাধুর্য, আছে লীলার সৌন্দর্য—আছে পরমপুরুষের অমৃতবাণী। যুগ যুগ ধরে সেই বাণীই পৃথিবীর নরনারীকে দেবে পথের সন্ধান।

॥ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী ॥

তোমার বাণী তাপিত জীবনে পীযূষ ধারা।
তাইতো বিশ্বভুবন সে বাণীতে আত্মহারা ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীগুলি 'কথামৃত' থেকে সংকলিত হয়েছে।

১। ঈশ্বর

ঈশ্বরদর্শনই মানবজীবনের উদ্দেশ্য।

ব্রহ্মের স্বরূপ মুখে বলা যায় না। তাঁর ইতি করা যায় না। তিনি নিরাকার, আবার সাকার।

সচ্চিদানন্দ সমুদ্র—কুল-কিনারা নাই। ভক্তি-হিমে স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়, বরফ আবার জমাট বাঁধে। ভক্তের কাছে তিনি সাকার রূপ ধরে থাকেন। জ্ঞান-সূর্য উঠলে সে বরফ গলে, তখন তাঁর রূপ দর্শন হয় না।

ভক্তের পক্ষে সগুণ ব্রহ্ম। তিনি সগুণ—একজন ব্যক্তি হয়ে, রূপ হয়ে দেখা দেন।

ব্যাকুল হয়ে তাঁর জন্য কাঁদতে পারলে ঈশ্বরকে দেখা যেতে পারে। যে ব্যক্তি সদা সর্বদা ঈশ্বর-চিন্তা করে, সেই জানতে পারে তাঁর স্বরূপ কি? সে ব্যক্তিই জানে যে তিনি নানারূপে দেখা দেন, নানাভাবে দেখা দেন - তিনি সগুণ, আবার নির্গুণ।

খুব রোক্ না হলে মানুষের ঈশ্বরলাভ হয় না। বিষয়বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে তাঁকে দর্শন হয় না। দেশলায়ের কাঠি যদি ভিজে থাকে হাজার ঘসো, কোনরকমেই জ্বলবে না—কেবল একরাশ কাঠি লোকসান হবে। বিষয়াসক্ত মন ভিজে দেশলাই। পাকাভক্তি, ভালবাসা যদি একবার হয়, তা'হলে সাকার-নিরাকার দুই সাক্ষাৎকার হয়।

২। চিত্তশুদ্ধি

চিত্তশুদ্ধি না হলে হয় না। কামিনী-কাঞ্চনে মন মলিন হয়ে আছে, মনে ময়লা পড়ে আছে। ছুঁচ কাদা দিয়ে ঢাকা থাকলে আর চুম্বকে টানে না। মাটি কাদা ধুয়ে ফেললে তখন চুম্বকে টানে। মনের ময়লা তেমনি চোখের জলে ধুয়ে ফেলা যায়। "হে ঈশ্বর, আর অমন কাজ করবো না" বলে কেউ যদি অনুতাপে কাঁদে, তা'হলে

ময়লাটা ধুয়ে যায়। তখন ঈশ্বররূপ চুম্বকপাথর মনরূপ ছুঁচকে টেনে লন।

ঘরে যদি আলো না জ্বলে, সেটি দারিদ্র্যের চিহ্ন। তাই হৃদয় মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বালতে হয়। "জ্ঞানদীপ জ্বেলে ঘরে, ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখ না।"

৩। সংসার

পিঁপড়ের মত সংসারে থাক। এই সংসারে নিত্য অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।

জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দরস আর বিষয় রস। হাঁসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে। আর পানকৌটির মত। গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত। পাঁকে থাকে কিন্তু গা দেখ, পরিষ্কার, উজ্জ্বল।

(সংসারে থেকে যে তাঁকে ডাকে সে বীর ভক্ত। ভগবান বলেন, যে সংসার ছেড়েছে সে তো আমায় ডাকবেই, আমার সেবা করবেই ; কিন্তু যে সংসারে থেকে আমায় ডাকে—বিশ মণ পাথর ঠেলে যে আমায় দেখে সেই-ই ধন্য, সেই-ই বাহাদুর, সেই-ই বীরপুরুষ।

সংসার কর্মভূমি। এখানে কর্ম করতে আসা।)

৪। পাণ্ডিত্য

(শুধু পাণ্ডিত্য মিথ্যা—দরকার সাধনা, বিবেক ও বৈরাগ্য।

যে পণ্ডিতের বিবেক নেই, সে পণ্ডিতই নয়। যদি আদেশ হয়ে থাকে, তা'হলে লোকশিক্ষায় দোষ নেই। আদেশ পেয়ে যদি কেউ লোকশিক্ষা দেয়, তাকে কেউ হারাতে পারে না।

ও-দেশে ধান মাপবার সময়, একজন মাপে, আর একজন রাশ ঠেলে দেয় ; তেমনি যে আদেশ পায় সে যত লোকশিক্ষা দিতে থাকে, মা আবার পেছন থেকে জ্ঞানের রাশ ঠেলে ঠেলে দেন। সে জ্ঞান আর ফুরায় না।)

৫। ঈশ্বরলাভের পথ

অমৃত-সাগরে যাবার অনন্ত পথ। যে কোন প্রকারে হোক এ সাগরে পড়তে পারলেই হোল।

ঈশ্বরলাভের অনন্ত পথ—তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি—যে পথ দিয়ে যাও আন্তরিক হলে ঈশ্বরকে পাবে।

এ যুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। এতে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগ আর অন্যান্য পথ দিয়েও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এসব পথ ভারি কঠিন।

৬। অহঙ্কার

অহঙ্কারই বিনাশের কারণ।

অহঙ্কার ত্যাগ না করলে ঈশ্বরের কৃপা হয় না।

অহঙ্কার ত্যাগ না করলে ঈশ্বর ভার লন না।

বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণ বসে আছেন; হঠাৎ নারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন। লক্ষ্মী পদসেবা করছিলেন; বললেন, ঠাকুর কোথা যাও? নারায়ণ বললেন, আমার একটি ভক্ত বড় বিপদে পড়েছে তাই তাকে রক্ষা করতে যাচ্ছি। এই বলে নারায়ণ বেড়িয়ে গেলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফিরলেন। লক্ষ্মী বললেন, ঠাকুর এত শীঘ্র ফিরলে যে? নারায়ণ হেসে বললেন, ভক্তটি প্রেমে বিহ্বল হয়ে পথে চলে যাচ্ছিল, ধোপারা কাপড় শুকাতে দিচ্ছিল, ভক্তটি মাড়িয়ে যাচ্ছিল। দেখে ধোপারা লাঠি দিয়ে তাকে মারতে যাচ্ছিল। তাই আমি তাকে রক্ষা করতে গিয়েছিলাম। লক্ষ্মী আবার বললেন, ফিরে এলেন কেন? নারায়ণ হাসতে হাসতে বললেন, সে ভক্তটি নিজে ধোপাদের মারবার জন্য ইঁট তুলেছে দেখলাম। তাই আমি আর সেখানে গেলাম না।

৭। যেমন ভাব, তেমনি লাভ

হাতী চলেছে পথ দিয়ে। সেই পথে বেড়াচ্ছিল তিনজন অন্ধ। হাতীর নাম শুনে তারা ছুটে এসে দেখতে লাগল হাতীর গায়ে হাত দিয়ে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে। একজনের হাত পড়েছিল পায়ে ; সে বললে—হাতী ঠিক থামের মত। আর একজনের হাত পড়েছিল পেটে ; সে বললে—জলের থালার মত। হাতীর কানে হাত রেখেছিল তৃতীয়জন। সে বলল—দূর, হাতী হচ্ছে কুলোর মত।

৮। পুরুষ ও প্রকৃতি

যিনি ব্রহ্ম, তিনিই আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি ; পুরুষ বলি। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এইসব করেন, তাঁকে শক্তি বলি ; প্রকৃতি বলি। যিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি। আনন্দময় আর আনন্দময়ী।

যিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তিনিই পালন করছেন। মা—জগতের মা। তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের সর্বদা রক্ষা করছেন। আর ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—যে যা চায়, তাই দেন।

আদ্যাশক্তি আর পরব্রহ্ম অভেদ। একটি ছেড়ে আর একটিকে চিন্তা করবার যো নেই। যেমন জ্যোতি আর মণি।

৯। অনুরাগ

অনুরাগ হলে ঈশ্বরলাভ হয়। খুব ব্যাকুলতা চাই। খুব ব্যাকুলতা হলে সমস্ত মন তাতে গত হয়।

একজনের একটি মেয়ে ছিল। খুব অল্পবয়সে মেয়েটি বিধবা হয়। স্বামীর মুখ কখনো দেখেনি। অন্য মেয়ের স্বামী আসে দেখে। সে একদিন বললে, বাবা, আমার স্বামী কই ? তার বাবা বললে, গোবিন্দ তোমার স্বামী ; তাকে ডাকলে তিনি দেখা দেন। মেয়েটি ঐ কথা শুনে ঘরে দরজা দিয়ে গোবিন্দকে ডাকে আর কাঁদে। বলে, গোবিন্দ! তুমি এস, আমাকে দেখা দাও, তুমি কেন আসছ না।

ছোট মেয়েটির সেই কান্না শুনে ঠাকুর থাকতে পারলেন না। তাকে দেখা দিলেন।

১০। ব্যাকুলতা

বালকের মত বিশ্বাস চাই। বালক মাকে দেখার জন্য যেমন ব্যাকুল হয়. সেই ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা হলো তো অরুণ উদয় হলো। তারপর সূর্য উঠবেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বর-দর্শন।

জটিল বালকের কথা আছে। সে পাঠশালে যেত। একটি বনের পথ দিয়ে পাঠশালে যেতে হোত ; তাই সে ভয় পেতো। মাকে বলাতে মা বললে, তোর ভয় কি ? তুই মধুসূদনকে ডাকবি। ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, মধুসূদন কে মা ? মা বললে, মধুসূদন তোর দাদা হয়। তখন একলা যেতে যেতে যেমনি ভয় পেয়েছে, অমনি ডেকেছে, দাদা মধুসূদন। কেউ কোথাও নেই। তখন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগল, কোথায় দাদা মধুসূদন। তুমি এসো, আমার বড় ভয় পেয়েছে। ঠাকুর তখন আর থাকতে পারলেন না। এসে বললেন, এই যে আমি. তোর ভয় কি ? এই বলে সঙ্গে করে পাঠশালার রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন, আর বললেন. তুই যখনি ডাকবি, আমি আসব। ভয় কি ? এই বালকের বিশ্বাস ! এই ব্যাকুলতা !

ব্যাকুলতা থাকলে সব পথ, সব মত দিয়ে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

১১। সত্যভাষণ

সংসারে থাকতে গেলে সত্য কথার খুব আঁট চাই। সত্যতেই ভগবানকে লাভ করা যায়।

পিতৃসত্য রক্ষার জন্য রামচন্দ্র বনবাসে গিয়েছিলেন, নইলে তাঁর তো বনে যাওয়ার কথা নয়। যে লোক বারো বছর সত্য কথা বলতে পারে, জানবে সে বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ।

তপস্যা বলো, তীর্থধর্ম বলো সব কিছুই পণ্ড হয়ে যায় যদি

সত্যের প্রতি তোমার অনুরাগ না থাকে। তুমি যদি সত্যবাদী না হও, তবে তোমার ঈশ্বরচিন্তা পর্যন্ত মিথ্যা হয়ে যেতে পারে। অমন যে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির, তাঁরো জীবনে একটা মিথ্যা কথা বলার জন্য নরক দর্শন হয়েছিল।

১২। ঈশ্বরের মহিমা

বাগানে কত গাছ, গাছে কত ডাল—এসব হিসাবে তোমার কাজ কি? তুমি বাগানে আম খেতে এসেছ, আম খেয়ে যাও। ঈশ্বরে ভক্তি প্রেম হওয়ার জন্যই মনুষ্য জন্ম। তুমি আম খেয়ে চলে যাও। তোমার অনন্ত কাণ্ড জানবার কি দরকার। তাঁর গুণ কোটি বৎসর বিচার করলেও কিছু জানতে পারবে না। ঈশ্বরের মহিমা অপার—অনন্ত।

১৩। বিষয়ী লোক

হাজার লেকচার দাও বিষয়ী লোকদের কিছু করতে পারবে না। পাথরের দেওয়ালে কি পেরেক মারা যায়? পেরেকের মাথা ভেঙ্গে যাবে তো দেওয়ালের কিছু হবে না। তরোয়ালের চোট মারলে কি হবে? সাধুর কমণ্ডলু চার ধাম করে আসে কিন্তু যেমন তেতো তেমনি তেতো। লেকচারে বিষয়ী লোকদের মনের পরিবর্তন করা যায় না।

১৪। কলিতে ভক্তিযোগ

কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি। শাস্ত্রে যে সকল কর্মের কথা আছে; তার সময় কৈ? আজকালকার জ্বরে দশমূল পাঁচন চলে না। দশমূল পাঁচন দিতে গেলে রোগীর এদিকে হয়ে যায়। আজকাল ফিবার মিক্শ্চার। কর্ম করতে যদি বল—তো ল্যাজামুড়া বাদ দিয়ে বলবে। আমি লোকদের বলি, তোমাদের 'তপোধন্যন্যা' ওসব অত বলতে হবে না! তোমাদের গায়ত্রী জপলেই হবে। কর্মের কথা যদি একান্ত বল তবে দু'একজনকে বলতে পার।

১৫। আচার্য কে হতে পারে ?

যে পণ্ডিতের বিবেক নেই, সে পণ্ডিতই নয়।

যদি আদেশ হয়ে থাকে, তা'হলে লোকশিক্ষায় দোষ নেই। আদেশ পেয়ে কেউ যদি লোকশিক্ষা দেয়, তাকে কেউ তাড়াতে পারে না। বাগ্বাদিনীর কাছ থেকে যদি একটি কিরণ আসে, তা'হলে এমন শক্তি হয় যে, বড় বড় পণ্ডিতগুলো কেঁচো হয়ে যায়। মায়ের যদি একবার কটাক্ষ হয়, তা'হলে কি আর জ্ঞানের অভাব থাকে ? মা আমার পেছন থেকে জ্ঞানের রাশ ঠেলে ঠেলে দেন। সে জ্ঞান আর ফুরোয় না।

তাই বলছি, হেঁজিপেঁজি লোক লেকচার দিলে কিছু কাজ হয় না। চাপরাস থাকলে তবে লোকে মানবে। ঈশ্বরের আদেশ না থাকলে লোকশিক্ষা হয় না। যে লোকশিক্ষা দেবে, তার খুব শক্তি চাই। যে আদেশ পায় না, তার লেকচারে কি উপকার হবে ?

১৬। যুগধর্ম—ভক্তি

এ যুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। এতে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগ আর অন্যান্য পথ দিয়েও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এসব পথ ভারী কঠিন। ভক্তিযোগই এ যুগের ধর্ম। কিন্তু তার এ মানে নয় যে, ভক্ত এক জায়গায় যাবে, জ্ঞানী বা কর্মী আর এক জায়গায় যাবে। এর মানে যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তি পথ ধরেও থাকেন, তা'হলে সেই জ্ঞান লাভ করবেন। ভক্তবৎসল মনে করলেই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন।

তীর্থে গিয়ে যদি ভক্তিলাভ না হোল, তা'হলে তীর্থে যাওয়ার আর ফল হোল না। ভক্তিই সার, একমাত্র প্রয়োজন। জগতের মাকে পেলে ভক্তিও পাবে, জ্ঞানও পাবে। জ্ঞানও পাবে, ভক্তিও পাবে। ভক্তি নিষ্কাম।

১৭। ভক্ত ও ভগবান

নারদ, প্রহ্লাদ, শুকদেব—এঁদের মতো ভক্ত হয় না। ভগবানের চেয়ে ভক্ত বড়। ভক্ত 'মোরে দেখে হীন, আপনাকে দেখে বড়'। যশোদা কৃষ্ণকে বাঁধতে গিয়েছিলেন। যশোদার বিশ্বাস, আমি কৃষ্ণকে না দেখলে তোকে কে দেখবে। কখনো ভগবান চুম্বক, ভক্ত ছুঁচ—ভগবান আকর্ষণ করে ভক্তকে টেনে লন। আবার কখনো ভক্ত চুম্বক পাথর হন, ভগবান ছুঁচ হন। ভক্তের এত আকর্ষণ যে তার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে ভগবান তার কাছে গিয়ে পড়েন।

১৮। হিন্দুধর্ম সনাতন ধর্ম

হিন্দুধর্মই সনাতন ধর্ম। ইদানীং যে সকল ধর্ম দেখছো এসব তাঁরই ইচ্ছাতে হচ্ছে কিন্তু থাকবে না। হিন্দুধর্ম বরাবর আছে, বরাবর থাকবে।

১৯। আত্মসমর্পণ

যার ঈশ্বরলাভ হয়েছে সে মন, প্রাণ, দেহ, আত্মা সমস্ত তাঁকে সমর্পণ করে। আত্মসমর্পণ ষোল আনা হোলেই বিষয় বুদ্ধি ত্যাগ হয়। বিষয়-রস শুকিয়ে যায়। বই বা শাস্ত্রের কি উদ্দেশ্য ? ঈশ্বর লাভ। সাধুর পুঁথি একজন খুলে দেখলে, প্রত্যেক পাতাতে কেবল 'রাম' নাম লেখা আছে। আর কিছুই নেই। এই হোল ঈশ্বরের ওপর ভালবাসা। এরই নাম আত্মসমর্পণ।

২০। দেবার মালিক একজনই—ঈশ্বর

একজন ফকির আকবর বাদশার কাছে কিছু টাকা আনতে গিছলো। বাদশা তখন নমাজ পড়ছেন আর বলছেন, হে খোদা ! আমায় ধন দাও দৌলত দাও। ফকির তখন চলে আসার উপক্রম

করলে। কিন্তু আকবর বাদশা তাকে বসতে ইসারা করলেন। নমাজের পর জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেন চলে যাচ্ছিলে। সে বললে, আপনি বলছিলেন, ধন দাও, দৌলত দাও। তাই ভাবলাম, যদি চাইতে হয়, ভিখারীর কাছে কেন ? খোদার কাছে চাইবো।

দেওয়ার মালিক সেই ঈশ্বর—মানুষ নয়।

২১। জীবনের উদ্দেশ্য

কি টাকা টাকা করছো! মান মান করছো! ওসব এখন ছেড়ে দিয়ে একচিত্ত হয়ে ঈশ্বরেতে মন দাও। ঐ আনন্দ ভোগ করো। ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু। জগৎচৈতন্য তিনি।

একটা গল্প শোনো। একজন রাজা ছিল। একটি পণ্ডিতের কাছে রাজা রোজ ভাগবত শুনতো। প্রত্যহ ভাগবত পড়ার পর পণ্ডিত রাজাকে বলতো রাজা, বুঝেছ ? রাজাও রোজ বলতো, তুমি আগে বোঝো। ভাগবতের পণ্ডিত বাড়ি গিয়ে রোজ ভাবে যে, রাজা রোজ এমন কথা বলে কেন! আমি রোজ এত করে বোঝাই আর রাজা উল্টে বলে, তুমি আগে বোঝো! এ কি হোল! পণ্ডিতটি সাধন-ভজন করতো। কিছুদিন পরে তার হুঁশ হোল যে, ঈশ্বরই বস্তু, আর সব—গৃহ, পরিবার, ধন, জন, মান-সম্ভ্রম সব অবস্তু।

তাই বলি, অনেক তপস্যার ফলে মানুষ জন্ম হয়েছে। এই জন্মে যদি ঈশ্বরলাভ না হোল, আর কোন জন্মে হবে ? তপস্যা চাই, সাধুসঙ্গ চাই, তবে ঈশ্বরলাভ হয়। শঙ্করাচার্য বলতেন, ঈশ্বর দর্শনের উপায় তিনটি—মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষত্ব আর মহাপুরুষ সংস্রয়।

যে ঈশ্বর লাভ করেছে সে অমৃত ফল লাভ করেছে। তার পুনর্জন্ম হয় না। তাইতো আমি সারা জীবন ধরে লোককে বলে আসছি—ওরে লাউ, কুমড়া ফল নিয়ে কি হবে, অমৃতফল লাভের চেষ্টায় লেগে যা। ঈশ্বরলাভই জীবনের উদ্দেশ্য।

২২। সব পথই সত্য

একটা পথ দিয়ে ঠিক যেতে পারলে তাঁর কাছে পৌঁছানো যায়। তখন সব পথের খবর জানতে পারে। যেমন একবার কোন উপায়ে ছাদে উঠতে পারলে কাঠের সিঁড়ি দিয়েও নামা যায়; পাকা সিঁড়ি দিয়েও নামা যায়; একটা বাঁশ দিয়েও নামা যায়; একটা দড়ি দিয়েও নামা যায়।

তাঁর কৃপা হোলে, ভক্ত সব জানতে পারে। তাঁকে একবার লাভ হোলে সব জানতে পারবে। একবার যে সে করে বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে হয়, আলাপ করতে হয়—তখন বাবুই বলে দেবে তাঁর ক'খানা বাগান, পুকুর, কোম্পানীর কাগজ।

অনন্ত মত অনন্ত পথ। ঈশ্বরলাভ করতে হোলে, একটা পথ জোর করে ধরে যেতে হয়।

২৩। গীতা

গীতা সব শাস্ত্রের সার। সন্ন্যাসীর কাছে আর কিছু না থাকে, একখানি ছোট গীতা থাকবে। গীতায় যা বলা হয়েছে সব ঈশ্বরের বাণী। এ তাঁরই মুখের কথা। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের মুখের কথা—আর কারো নয়। আমি শাস্ত্র পড়িনি; কিন্তু মায়ের মুখে সব শাস্ত্রের সার কথা শুনেছি। আমি মার মুখের কথার সঙ্গে না মিললে কিছুই নিই না।

২৪। বিবিধ

ধ্যান করবে মনে, কোণে ও বনে। সর্বদা সৎ ও অসৎ বিচার করবে।

মাঝে মাঝে ঈশ্বরচিন্তার সঙ্গে তাঁর নাম গুণ কীর্তন করা ভাল। গানে রামপ্রসাদ সিদ্ধ। ব্যাকুল হয়ে তাঁর গান গাইলে ঈশ্বর-দর্শন হয়।

গীতার অর্থ কি? দশবার বললে যা হয়। 'গীতা', 'গীতা' দশবার বলতে গেলে 'ত্যাগী' 'ত্যাগী' হয়ে যায়।

হাজার চেষ্টা কর, তাঁর কৃপা না হলে কিছু হয় না। ভগবানের জন্য ব্যাকুল হওয়া ঠিক সময় হলেই হয়।

কেঁদে নির্জনে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে, যাতে কর্মগুলি নিষ্কামভাবে করা যায়। আর বলবে—হে ঈশ্বর! আমার বিষয়কর্ম কমিয়ে দাও।

টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়, এই পর্যন্ত; ভগবান লাভ হয় না। তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না।

ঈশ্বর কল্পতরু। ঈশ্বর ভাবগ্রাহী। যে যা মনে করে সাধনা করে, তার সেইরূপই হয়। তাঁর কাছ থেকেই চাইতে হয়। তখন যে যা চায়, তাই পায়।

এই সাড়ে চৌদ্দ পোয়া খোলের মধ্যেই ঈশ্বর রয়েছেন। হরিণের নাভিতে কস্তুরী জন্মায়; তখন তার গন্ধে হরিণগুলো দিকে দিকে ছুটে বেড়ায়—জানে না যে, কোথা থেকে গন্ধ আসছে। তেমনি ভগবান এই মানুষের দেহের মধ্যেই রয়েছেন; মানুষ তাঁকে জানতে না পেরে ঘুরে-ঘুরে মরছে।

ষোল আনা মন তাঁর জন্যে দিলে তবে তাঁকে পাবে। একটু খুঁত থাকলে আর যোগ হওয়ার উপায় নেই। টেলিগ্রাফের তারে যদি একটু ফুটো থাকে, তাহলে আর খবর থাকে না। ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বঘটে বিরাজমান। যেমন নীচে, তেমনি আকাশে। স্থানে কোথাও তাঁর বিচ্ছেদ নেই, কালে কোথাও বিরাম নেই, পাত্রে কোথাও তাঁর বিভেদ নেই। তবু আবার তিনি স্থান-কাল-পাত্রের অতীত।

সকল মতে, সকল পথেই কিছু না কিছু ভাল আছে। ধর্মের মানে সম্প্রদায় নয়, অনুভূতি।

আমার ধর্মই ঠিক আর সকলের মিথ্যা—এ ভাব ভাল নয়। তিনিই সব হয়েছেন—মানুষ, প্রতিমা, শালগ্রাম—সকলের মধ্যে বিরাজ করছেন এক তিনি। এক ছাড়া দুই নেই।

এক ঈশ্বরকে লোকে নিজের নিজের ভাব ও প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্নরূপে উপাসনা করে থাকে। এক রাম—তাঁর হাজার নাম। বেদে যাঁকে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বলছে, পুরাণে তাঁকেই সচ্চিদানন্দ শিব বলেছে। বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন মত, সেই একজনেরই কথা বলেছে।

যতক্ষণ দেহবুদ্ধি ততক্ষণই সুখদুঃখ, জন্ম মৃত্যু, রোগ শোক। দেহেরই এইসব ; আত্মার নয়। আত্মজ্ঞান হলে সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যু স্বপ্নবৎ বোধ হয়।

তপস্যা চাই, তবে বস্তুলাভ হবে। শাস্ত্রের শ্লোক মুখস্থ করলেও কিছু হবে না। 'সিদ্ধি' 'সিদ্ধি' মুখে বললে নেশা হয় না। সিদ্ধি খেতে হয়। তাঁর নামে বিশ্বাস কর। তা'হলে সব তীর্থাদিরও প্রয়োজন হবে না। জানো তো সেই গানটা—

গয়াগঙ্গা, প্রভাসাদি, কাশী কাঞ্চি কেবা চায়।
কালী কালী কালী বলে অজপা যদি ফুরায়॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়॥
কালী নামে কতগুণ কেবা জানতে পারে তায়।
দেবাদিদেব মহাদেব যাঁর পঞ্চমুখে গুণ গায়॥

তাঁর নানা রূপ, নানা লীলা। ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, নরলীলা, জগৎলীলা। তিনি মানুষ হয়ে, যুগে যুগে আসেন।